অমৃত-প্রসঙ্গ

জিতেন্দ্রশঙ্কর
ও
প্রফুল্লময়ী

অমৃত প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের অমৃত কথা-প্রসঙ্গ)

শ্রীজিতেন্দ্র শঙ্কর দাশগুপ্ত বি এল্

ও

শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী

১৩৩৮ সাল

কলিকাতা

মূল্য একটাকা মাত্র

প্রকাশক—
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়
২০৩।৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
১৩৩৮ সাল

প্রিণ্টার—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ
ঘোষ মেসিন-প্রেস
৩৮নং শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা

উৎসর্গ

যাঁহাদের দর্শনে শ্রীশ্রীগুরুদেবের স্মৃতি হৃদয়ে জাগে,
যাঁহাদের স্পর্শে প্রাণ শীতল হয়, যাঁহাদের সহিত
সর্ব্বমালিন্যশূন্য অপার্থিব নিত্য সম্বন্ধ, যাঁহাদের
সঙ্গে আনন্দে, নিরানন্দে, তাপে, শান্তিতে,
একসূত্রে অন্তর গ্রথিত রহিয়াছে আমার
সেই গুরুগতপ্রাণ গুরুভ্রাতৃদের
শ্রীকরকমলে শ্রীশ্রীঠাকুরের
পুণ্যস্মৃতি-গাথা অর্পিত
হইল ।

স্নেহের—"শঙ্কর"

ভূমিকা

শ্রীশ্রীগুরুদেবের প্রথম বাৎসরিক তিরোভাব তিথি দিবসে আমাদের এই স্মৃতি গাথা প্রকাশ করিবার জন্য গত ৩।৪ মাস যাবৎ চিন্তা করিয়া আসিতেছি। ঠাকুরের দেহরক্ষার পর হইতেই তাঁহার অমৃতময় উপদেশ-গুলি সর্ব্বদা স্মরণ-পথে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম। ১৩৩৬ সালের মহাহোমের সময় ঠাকুর বলিয়াছিলেন "আমার অবর্ত্তমানে আমার স্মৃতিতেই তোমাদের কল্যাণ হইবে"। ইহা মনে করিয়া অবসরের সময়, ঠাকুরেব যে সকল কথা পূর্ব্বে বিক্ষিপ্তভাবে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আকারে লিখিতে আরম্ভ করিয়া দিলাম। কিন্তু এত শীঘ্র যে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতে পারিব তাহা মোটেই আশা করিতে পারি নাই। মাত্র একমাস পূর্ব্বে আমার অত্যন্ত স্নেহের গুরুভ্রাতা, এই পুস্তকের প্রকাশক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় আমাকে ইহা ছাপাইবার জন্য উৎসাহ দিতে লাগিলেন। একমাত্র তাঁহারই উৎসাহে এবং ঐকান্তিক পরিশ্রমে এত অল্প সময়ের মধ্যে ইহা প্রকাশিত হওয়া সম্ভব হইল। এইজন্য তাঁহার নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত বগলাপদ বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মহানন্দ নন্দী, শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত প্রবোধগোপাল ঘোষ, নোয়াখালীবাসী শ্রীযুক্ত শশীকুমার রায়, শ্রীযুক্ত চুনীলাল দে এবং অন্যান্য অনেক গুরুভ্রাতাগণও আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়াছেন, সেইজন্য আমি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।

পরিশেষে, আমার অকৃত্রিম বাল্যবন্ধু—যাঁহার নিকট আমার জীবনের কোন কথা লুক্কায়িত নাই এবং যাহার স্নেহের ঋণ আমি জীবনে কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না—শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রিয় ও স্নেহের গুরুভ্রাতা সেই শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ গুহ রায় মহাশয় এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া আমাকে অনেক সাহায্য করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে আমার অন্তরের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

প্লট নং ২৯ লেক্‌রোড
"বিন্ধ্যনিবাস"
৩২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ সাল।

ইতি—জিতেন্দ্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

সূচীপত্র

গুরু বন্দনা

যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বস্তিদিব্যৈঃ স্তবৈ
বৈদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো;
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দাতীতং গগন সদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যং।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষীভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং ত্বং নমামি॥

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

মন্নাথো শ্রীজগন্নাথ মদ্‌গুরু শ্রীজগদ্‌গুরু।
মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

শ্রীশ্রীগুরুরূপ

কে বর্ণিবে সেইরূপ লীলারস প্রস্রবণ,
অনন্ত আনন্দ খনি পরা শান্তি নিকেতন।
অপরূপ শোভা রাশি,
অপরূপ সুধা হাসি,
অপরূপ রাঙ্গাপদ শতদল অতুলন ;
অপরূপ সে মাধুরী,
প্রেম যেন মূর্ত্তি ধরি,
লাবণ্যের নিত্য লীলা অপরূপ সুগঠন !
বিলম্বিত জটাজুটে,
জাহ্নবী লুকায়ে ছুটে,
ভালে শশী রেখা ঢাকা বিভূতির আচ্ছাদন ;
মুনি ঋষি মনোলোভা
সে সুঠাম অঙ্গশোভা
করেছে সে পূর্ণশশী অমানিশি আবরণ !
শঙ্করেরি ছদ্মবেশে,
জগত তারিলে এসে,
আচণ্ডালে কোল দিলে করি নাম বিতরণ !
নিত্য লীলাময় নাম,
নিত্য জ্যোতির্ম্ময় ধাম,
ঝল্‌মল্‌ চিদাকাশে কবে হ'বে নিত্য ধন !

শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী



পরমারাধ্য শ্রীশ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজীর তিরোভাব দিবসে

মহা প্রস্থান।

হে সমুদ্র ! মেঘমন্দ্রে কি কাহিনী কহিছ হে আজ ?
ঊর্ম্মি বাহু ঊর্দ্ধ করি ফেনচ্ছলে বরষিছ লাজ
কাহার চরণোদ্দেশে ? অঙ্কে তব এল যোগীশ্বর—
মগ্ন মহা সমাধিতে, পুষ্পশয্যা অঙ্গে মনোহর।
আছাড়ি বিছাড়ি তনু কি দেখিছ, কি দেখিছ আর ?
অফুরানো দীর্ঘশ্বাসে কর অফুরানো হাহাকার !
শোভাহীন "রথযাত্রা" "জয় জয় জগবন্ধু" বলি,
কে অমন ঢেলে দিবে প্রাণভরা ভক্তির অঞ্জলি !
চেয়ে দেখ অম্বুনিধি ! "পুরী" আজ আঁধারের ক্রোড়ে !
আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পুষ্পকম তরুণ কৈশোরে ;
চিরত্যাগী, যুক্তযোগী, চিরভোগী চির-উদাসীন,
পরা ভক্তি প্রচারিতে কে হবে দীনাতিমহাদীন ?
শোক ভুলিয়াছে শোকী বসি রাঙ্গা শ্রীচরণতলে,
রোগী রোগজ্বালা যেন জুড়ায়েছে স্নেহমন্ত্র বলে !
পণ্ডিত জ্ঞানাভিমান ভুলে গেছে অজ্ঞাতে অমনি,
তার্কিক ছেড়েছে তর্ক প্রেমময় হেরি সে চাহনি।
লটপট জটাজুট বিমণ্ডিত মোহন মাধুরী,
তব সে "সদ্‌গুরুসঙ্গ" ভক্তচিত্ত করিতেছে চুরি !

ওগো, ধ্যানের অপূর্ব্ব ধন ! ভোগমাঝে ত্যাগের কাহিনী;
দেখায়ে কে আর চিত্তে বিদলিবে লালসা-বাহিনী ?
"নব যৌবনের" দিনে ছাড়ি তপঃক্লিষ্ট জীর্ণ দেহ
লভিলে যৌবন নব ; ভুলে হায় ! এত শিষ্যস্নেহ
হে গুরুবৎসল গুরু ! চলে গেলে ইষ্ট পদতলে,
জন্মভরা কৃচ্ছ্রব্রত উদ্যাপিত সমাধি অতলে !
ছিলে উৎসবের উৎস, নিত্য শান্তিময় গুণগ্রাম ;
নিন্দা স্তুতি তুল্য মানি আচণ্ডালে বিলাইলে নাম !
নমো নমঃ ওগো নামী ! ওগো নাম ! নিত্য নমো নমঃ
নমো নমঃ নামদাতা ! অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষম !
নিত্যধাম হ'তে দেব, আজ শুধু কর আশীর্ব্বাদ,
স্মৃতি উজলিয়া থেকো, চাই এই পরম প্রসাদ ।

শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী

শ্রীশ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজির

অমৃত প্রসঙ্গ।



নিবেদন।

পরম আরাধ্য গুরুদেব শ্রীশ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় বর্ত্তমান যুগে পুরাতন আর্য্য ঋষিগণের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহার সহস্র সহস্র শিষ্যমণ্ডলীর জীবনে যে অদ্ভুত কৃপা বর্ষণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা জনসাধারণের নিকট আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। তিনি নীরব সাধনায় মগ্ন ছিলেন। লোকচক্ষুর অন্তরালে, এবং পৃথিবীর কোন নিভৃত প্রান্তরে কিংবা দুর্গম পর্ব্বত গুহাতে সারাটী জীবন কাটাইয়া দেওয়াই তাঁর সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু তাঁহার তীব্র সাধনার জ্যোতিঃতে আকৃষ্ট হইয়া ত্রিতাপ দগ্ধ বহু নরনারী তাঁহাকে তাঁহার সাধনার প্রিয় স্থান হইতে সংসারের মধ্যে আনিয়া, সেই সুবিশাল তরুর শীতল ছায়ায় প্রাণ জুড়াইয়াছে। আজ তিনি তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহে এ পৃথিবীতে বিরাজমান না থাকিলেও, তাঁহার কৃপাবৃষ্টি যে অজস্রভাবে জগতের কল্যাণের জন্য বর্ষিত হইতেছে তাহার যথেষ্ট প্রমান বর্ত্তমান আছে। প্রথম যৌবনে তাঁহার পরমারাধ্য গুরুদেব আচার্য্য শ্রীশ্রীমৎবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর সংস্পর্শে আসিয়া, ও নিরবিচ্ছিন্ন সংসর্গে থাকিয়া, তীব্র সাধনার বলে কিরূপভাবে পূর্ণ যৌবনের উত্তাল তরঙ্গের গতিরোধ করিয়াছেন, এবং সুদীর্ঘ ১৩ বৎসর সেই মহান্ সঙ্গে কিরূপভাবে তাঁহার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী জীবন ক্রমে ক্রমে গঠিত হইয়াছিল, তাহা তিনি

স্বহস্তে তাঁহার "শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ"-গ্রন্থের ৫টী খণ্ডে বিশদভাবে বিবৃতি করিয়া গিয়াছেন। উহাতে ৮ বৎসরের জীবন মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় বাকী ৫ বৎসরের ডায়েরী তিনি প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই—উহা আর প্রকাশ হইবে কিনা তাহা অন্তর্যামীই জানেন। উক্ত গ্রন্থ জনসাধারণের নিকট বিশেষ আদরণীয় হইয়াছে। গোস্বামী প্রভুর দেহত্যাগের পর দীর্ঘ ৭ বৎসরকাল তিনি গয়ায় আকাশগঙ্গা পাহাড়ে তীব্র সাধন-ভজন করিয়া, অতি কৃচ্ছ্রতার সহিত জীবনযাপন করিয়াছিলেন। তখনকার জীবনের বহু ঘটনা তিনি বিশেষভাবে প্রকাশ করেন নাই। তারপর গত ২৫।২৬ বৎসর তিনি শিষ্যমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া তাঁহার সাধনার ক্ষেত্র বাঙ্গলার বহুস্থানে প্রসার করিয়াছিলেন।

সাধন-ভজন-হীন এই অভাজন লেখক একজন আইন ব্যবসায়ী, এবং জীবনের বহুমূল্য সময় বৃথা কার্য্যে যাপন করিয়া হঠাৎ একদিন প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার চরণে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। এইরূপ লোকের পক্ষে পূণ্যময় জীবনের কথা প্রসঙ্গ করিতে যাওয়া যে ধৃষ্টতামাত্র তাহা তাহার অবিদিত নাই। কিন্তু তবুও লেখক যে এই অসমসাহসিক কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, বিগত ১৫ বৎসর যাবৎ সেই আলোকময় জ্যোতিঃর দিকে তাকাইয়া সেই জ্যোতিঃর স্ফুলিঙ্গ কণাগুলি দেখিবার সে একটা আকুল চেষ্টা করিয়াছিল এবং নিজের জীবনের কল্যাণের জন্য যখন যে মহামূল্য উপদেশ সেই শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছিল তখনই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। এখন তাহার স্মরণমাত্রেই দেখিতে পাওয়া যায় যে হৃদয় পবিত্র হইয়া যায়। আমার সতীর্থ বহু গুরুভ্রাতা এখন শ্রীমুখের ঐ সকল উপদেশের সহিত, তাঁহার বিগত ১৫ বৎসরের জীবনের সাধারণ ঘটনাগুলি কিঞ্চিন্মাত্র রক্ষা করিবার উপায় হইয়াছে বলিয়া, উহা প্রকাশ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন। আমার নিজের জীবন গঠন করিবার উদ্দেশ্যে

যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা জনসাধারণের নিকট ভাল লাগিবে কিনা জানিনা।

কেহ কেহ আমাকে তাঁহার জীবনচরিত লিখিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস জীবনের কয়েকটী বিশেষ বিশেষ ঘটনা সন্নিবেশ করিয়া যোজনা করিয়া দিলেই জীবন-চরিত হয় না। নায়কের চিন্তার ধারার ক্রমবিকাশ, বিশেষতঃ সাধু মহাপুরুষের সাধনার চিত্র, জীবন চরিতে প্রস্ফুটিত না হইলে তাহা বৃথা। বিশেষ সাধন-ভজন নিষ্ঠ পুণ্যবান লোক ছাড়া সিদ্ধ মহাপুরুষের জীবনচরিত লেখা সম্ভব নয়। ইহা ছাড়া তিনি তাঁহার জীবনের বহু ঘটনা কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়া যান নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস, এমতাবস্থায় তাহার জীবনচরিত লেখা বড়ই দুরূহ কার্য্য বলিয়া আমি উহা লিখিতে প্রয়াস পাইলাম না।

আমার কথা

আমি কি ভাবে গুরুদেবের সংস্পর্শে আসিয়া পড়িয়াছিলাম, একটু সংক্ষেপে তাহার বিবৃতি না দিলে পরবর্ত্তী অধ্যায় গুলি বড়ই অপরিস্ফুট হইবে বিবেচনা করিয়া আমার জীবনের সামান্য কয়েকটী কথা লিখিতে বাধ্য হইলাম। আমি অতি ক্ষুদ্র জীব, আমার জীবনের কথা সাধারণে প্রকাশ করিবার কিছুই নাই, এবং করিলেও তাহা কাহারও প্রয়োজনে লাগিবে না আমি তাহা বিশেষ জানি, কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের সংসর্গে আসিয়া, তাঁহারই আদেশে আমি তাঁহার কতকগুলি কথা প্রথমে লিপিবদ্ধ করি, এবং তখন হইতেই আমার তীব্র ইচ্ছা হয় যে, তাঁহার

শ্রীমুখের বাণী আমি স্বকর্ণে যাহা শুনিয়াছি, তাহা সমুদয় লিখিয়া রাখিব। সেই জন্য যে অবস্থায় পড়িয়া যে সকল ঘটনার বিবৃতি করিয়াছি, তাহা পরিষ্কার বুঝাইবার জন্য আমার দীক্ষার পূর্ব্বেকার মনের অবস্থা এবং দীক্ষার পর হইতে মনের যে সকল পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার একটু বিশ্লেষণ করিতে বাধ্য হইতেছি। এবং যে সকল গুরু ভ্রাতাদের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ও পরিচয় দিতে বাধ্য হইয়াছি।

গোস্বামী প্রভুর কথা

পরম গুরুদেব শ্রীশ্রী৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর মহাশক্তির খেলা যে আমার জীবনের উপর দিয়াও বহিয়া যাইবে, তাহা বাল্যকালে একবারও কল্পনা করিতে পারি নাই। আমার ভাগ্যে তাঁহার দেহাশ্রিত অবস্থা দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই—যদিও তাঁহার দেহ রক্ষার সময় আমার ১৫ বৎসর বয়স হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের স্কুলের প্রথম শিক্ষক মহাশয় তাঁহার শিষ্য ছিলেন, এবং তাঁহার কঠোর সাধন ভজন বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছিলাম; তাহাতে গোস্বামী প্রভুর উপর আমার অন্তরে একটা অগাধ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। বরিশালের স্বনামধন্য সরকারী উকীল ৺গোরাচাঁদ দাস মহাশয় তাঁহার একজন শিষ্য এবং আমার পিতৃবন্ধু ছিলেন। বাল্যকালে তাঁহাকেও আমাদের বাটীতে আসিয়া নিতান্ত অকিঞ্চনের ন্যায়, সামান্য অবস্থায় একতারা সংযোগে নাম সঙ্গীত করিতে করিতে বিহ্বল অবস্থা দেখিয়াছি, তাহাতেও আমার বাল্য হৃদয়ে বড় বিস্ময় জন্মিত। আজিও

তাঁহার স্মৃতি ভুলিতে পারি নাই, এবং বহুদিন পর্য্যন্ত ভাবিতাম, অত সুখ ঐশ্বর্য্যের ভিতর থাকিয়াও তাঁহার মত অত বড় লোকেরও কিরূপ সরল ভাবে ধর্ম্ম জীবন যাপন করিবার তীব্র স্পৃহা জন্মিয়াছিল। তাহার পর ১৮৯৮ সালের মান্দ্রাজ কংগ্রেস হইতে প্রত্যাগত হইয়া পিতৃদেবের মুখে গোস্বামী প্রভুর পুরী অবস্থান কালের দর্শনের বিবরণ শুনিয়া মনে মনে একবার তাঁহাকে দর্শন করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতাম, কিন্তু তাহার অল্প পরেই তাঁহার দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে গোস্বামী প্রভুর কথা অনেক দিন পর্য্যন্ত একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলাম।

৺অশ্বিনীকুমার দত্ত

বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে ২ বৎসর অধ্যয়ন কালে পুণ্যশ্লোক স্বর্গীয় অশ্বিনী কুমার দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়াছিলাম। তিনি আমার পিতৃবন্ধু ছিলেন। অশ্বিনী বাবুর বালকের ন্যায় সরল স্বভাব, সদা হাস্যময় মুখখানি সর্ব্বদাই মনে পড়ে। বালকদিগকে কি প্রাণ ঢালিয়াই তিনি ভাল বাসিতেন! তিনিও গোস্বামী প্রভুর শিষ্য ছিলেন। তিনি শুধু অধ্যাপক ছিলেননা, ছাত্রদিগের নৈতিক জীবন গঠন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। তাঁহার সঙ্গের প্রভাবে জীবনে যে ধর্ম্ম বীজের অঙ্কুর জন্মিয়াছিল, তাহারই ফলে বোধ হয় ভবিষ্যতে সদগুরুর আশ্রয় লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।

৺মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা

পাঠ্য জীবন প্রায় সমাপ্ত হইতে না হইতেই ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ দেশে ছড়াইয়া পড়িল। আমরাও সকলে তাহাতে গা ঢালিয়া দিয়াছিলাম। তখন চতুর্দ্দিকে সভা সমিতি বক্তৃতা ইত্যাদি লইয়াই সকলে ব্যস্ত—ধর্ম্মের স্রোতে যেন অনেক বাধা পড়িয়াছিল—সেই স্বদেশীর যুগে সকলের মুখেই দেশের কথা। কিন্তু তাহার মধ্যে একদিন সৌম্যমূর্ত্তি, প্রসিদ্ধ বাগ্মী ৺মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়কে দেখিলাম। তাঁহাকে আমাদের দেশে (কলিয়াতে) স্বদেশী বক্তৃতা করিবার জন্য কলিকাতা হইতে লইয়া গিয়াছিলাম। ষ্টীমারে এক সঙ্গে যাইতেছিলাম, তিনি স্বদেশীর কথা ছাড়িয়া দিয়া আমাদের সঙ্গে ধর্ম্মের কথা বলিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া ভগবানের নাম স্মরণ করিতে হয় এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে হয়, ইহা আমাদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একটী ব্যায়াম দেখাইয়া বলিলেন রোজ ঐরূপ করিলে শারীরিক ও মানসিক উভয়ই উন্নতি হয়। বক্তৃতাকালেও দেখিলাম মূলে ধর্ম্মের সঙ্গে সংযোগ রাখিয়া সুন্দর ভাষায় সারবান সব কথা বলিতে লাগিলেন। তখন জানিতাম না, শেষে শুনিয়াছিলাম তিনিও গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য। এইরূপে আমার অলক্ষ্যে গোস্বামী প্রভুর সহচর ও শিষ্যগণের যে প্রভাব বহিয়া যাইতে লাগিল তাহা তখন বিন্দুমাত্রও বুঝিতে পারি নাই।

১৯০৮ সালে কলিকাতায় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম এই সুদীর্ঘ দশ-বৎসরের মধ্যে গোস্বামীপ্রভুর নামও মনে হইয়াছে কিনা সন্দেহ—তাঁহার কোনও প্রসঙ্গও কখনও করি নাই—কিন্তু এখন দেখিতেছি যে তিনি

আমাকে ইহার মধ্যেও ভুলেন নাই—আমাকে তাঁহার স্নেহময় ক্রোড়ে তুলিয়া লইবার জন্য তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত তাঁহার প্রিয় শিষ্যগণের সহিত আমার সংস্পর্শ করাইয়া দিয়াছেন—যদিও তাহা ক্ষণিক—তবুও আজ মনে হয়, আস্তে আস্তে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে আমার সম্মুখে আনিয়া আমাকে একেবারে তাঁহার নিজগণের মধ্যে করিয়া লইয়াছেন। কি অদ্ভুত কৃপা! এই কৃপা না হইলে যে কোথায় ভাসিয়া যাইতাম কে জানে।

ঠাকুরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ।

১৯০৯ সালে আমার গুরু ভ্রাতা জ্যেষ্ঠতাত বড় ভাই (শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র শঙ্কর দাশ গুপ্ত) হাজারী বাগে Overseer ছিলেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি ধানবাদে গুরু ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অচ্যুৎকুমার নন্দী মহাশয়ের অধীনে চাকুরী করিতেন। অচ্যুৎ বাবু সেইখানেই থাকিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন। দাদাও তাহার প্রভাবে দীক্ষাপ্রার্থী হইয়া একদিন আমার কলিকাতার বাটীতে আসিয়া আমাকে বলেন যে, চন্দন নগরে শ্রীশ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কাছে তিনি দীক্ষা লইবার জন্য আসিয়াছেন। জীবনে সর্ব্ব প্রথম সেই গুরুদেবের নাম শুনিলাম। ইহার পূর্ব্বে কখনও নাম শুনি নাই, এবং দীক্ষা লওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ভাবিও নাই। আমরা দুই জনে বাল্যকাল হইতে এক সঙ্গে মানুষ হইয়াছি, এবং রাম লক্ষ্মণের মত গলাগলি ধরিয়া বেড়াইয়াছি। আমার বিশ্বাস ছিল আমাদের উভয়েরই এক চিন্তার ধারা। হঠাৎ দাদার মুখে দীক্ষার কথা শুনিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইলাম। আমি দীক্ষার কোনও প্রয়োজন থাকিতে পারে ইহা কখনও কল্পনাও করিতে পারি নাই। কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া যাইব, পিতামাতার সেবা

করিব। পিতামাতাই তো সর্ব্ব প্রধান গুরু বলিয়া জানি, আবার গুরুর আবশ্যক কি? অবসর মত বড় জোর সৎকথা বলিব, ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা করিব এবং সর্ব্বদা কর্ত্তব্য কর্ম্ম, যাহা নিজে ভাল বুঝি, যাহা আমার বিবেক বলিয়া দিবে, তাহাই করিব। আর বেশী কি প্রয়োজন? দাদার সঙ্গে একটু তর্কও করিলাম কিন্তু দেখিলাম দাদা কৃতসঙ্কল্প; আমি আর কোনও বাধা দিলাম না—দাদা একদিন চন্দন নগরে যাইয়া দীক্ষা লইয়া আসিলেন। দাদার সর্ব্বাঙ্গে যেন এক প্রকার জ্যোতিঃ দেখিলাম—হৃদয়টী যেন একেবারে গলিয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন চন্দন নগর আশ্রমেই থাকিতেন। আমার কিন্তু তখন ঠাকুরকে দর্শন করিবার ইচ্ছাও বিশেষ হইত না, তবে দাদার অনুরোধে একদিন গিয়াছিলাম। বোধ হয় ১৯০৯ সনের জুলাই মাসে একদিন রবিবার গুরুদেবের প্রথম দর্শন লাভ হয়। তখন চন্দন নগর আশ্রম দোতালা হয় নাই। সাম্‌নের বিস্তৃত জায়গা, যেখানে এখন প্রতি বৎসর মহাহোম হইয়া থাকে তাহা হয় নাই। কেবল মাত্র নিচের তিনখানা ছোট কামরা ছিল। এবং দক্ষিণ দিকের গলির ভিতর দিয়া ঢুকিবার পথ। দাদা আমাকে পরিচয় করাইয়া দিলেন। ঠাকুর মধ্যের ঘরে একখানি আসনে বসিয়া আছেন—অত দীর্ঘ জটা জুটধারী কোনও সাধু বা সন্ন্যাসীকে অত নিকটে জীবনে এই প্রথম দেখিলাম। আমার কিন্তু সাধু সন্ন্যাসী দেখিলে যেমন একটা স্বাভাবিক ভক্তির ভাব হয় তখনও সেইরূপ। সাধুর নিকট দুইটা উপদেশের কথা শুনিব এই জন্যই সাধুর নিকট যাওয়া দরকার, ইহাই আমার ধারণা। সাধুর ভিতর দিয়া যে ভগবান্ সদ্‌গুরু রূপে প্রকাশিত হইয়া অন্যের জীবনে শক্তি সঞ্চার করিয়া থাকেন এইরূপ কোনও ধারণা আমার নাই। ঠাকুর আমাকে তাঁহার স্বাভাবিক সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিদ্বারা আদ্যোপান্ত দেখিলেন। সেই দৃষ্টিতে আমার মনে হইল আমার অন্তঃস্থল সমুদয় দেখিয়া লইলেন। আমি তাঁহার নিকট বালক, তবুও

আমাকে "আপনি" ইত্যাদি বলিয়া কত আদর করিয়া সাধারণ ভাবে অনেক কথাবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। আলীপুরে ওকালতী করি বলিয়া বাবু হেমেন্দ্র নাথ মিত্র Public Prosecutor মহাশয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং বলিলেন তিনি তাঁহার গুরুভ্রাতা।

সাধু দেখিলে কিছু সৎপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হয়, এইরূপ ধারণা ছিল বলিয়া যুবকের মনে সাধারণতঃ যে প্রশ্ন আসে তাই জিজ্ঞাসা করিলাম "মাঝে মাঝে মনের মধ্যে কুভাব ও কুচিন্তাগুলি কয়েকদিন ক্রমাগত এমন অধিকার করিয়া বসে, যে কিছু দিন উহা কিছুতেই ছাড়াইতে পারি না। আবার হয়তো কিছু দিন বেশ ভাল ভাব ও চিন্তা মনে হয় এইরূপ alternately চলিতে থাকে ইহার কি উপায় করিব।

ঠাকুর উত্তর করিলেন "ঐরূপই হইয়া থাকে উহাতে ক্ষতি নাই। মাঝে মাঝে যে ভাল ভাব মনে আসে ইহাই তো খুব ভাল লক্ষণ। অনেকের তো তাহাও হয় না। এই ভাবেই চলিতে থাকুন সময়ে সব ঠিক হইয়া যাইবে।"

অত্যন্ত স্নেহমাখা স্বরে কথাগুলি বলিলেন। চক্ষুতে ও মুখে যেন সহানুভূতি মাখান রহিয়াছে। আমি ২৫।২৬ বৎসরের যুবক আর তাঁহার প্রায় ৪৫ বৎসর, আমি আর বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। দাদার আশা ছিল যদি আমার দীক্ষা লওয়ার মতি হয় কিন্তু আমার সেদিক দিয়া বিন্দু মাত্রও ইচ্ছা হইল না।

দীক্ষার পূর্ব্বে মানসিক অবস্থা

বৎসরের পর বৎসর অতীত হইয়া যাইতে লাগিল। দাদা হাজারী বাগ থাকিয়া বিশেষ যত্ন সহকারে সাধন ভজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার উচ্ছিষ্ট বিচার, মাংস আহার না করা ইত্যাদি লইয়া যখনই দেখা হইত তখনই আমার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়া যাইত। ধর্ম্মের সঙ্গে আহারের কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে, ইহা আমি বিশ্বাস করিতাম না। নিজে অতিরিক্ত মাংসাহারী ছিলাম এবং খাদ্যাখাদ্যের কোন বিচার করিতাম না।

ব্যবসায়ের কার্য্য উপলক্ষে হেমেন্দ্র বাবুর সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল এবং আমাকেও আমার স্ত্রীকে তিনি বিশেষ স্নেহ করিতেন। আমার স্ত্রী তাঁহার এবং তাঁহার স্ত্রীর মৃতা কন্যার স্থান অধিকার করিয়াছিল। হেমেন্দ্র বাবু প্রতি বৎসর ঝুলন পূর্ণিমাতে খুব জাঁক জমকের সহিত গোস্বামী প্রভুর জন্মোৎসব করিতেন, এবং আমাদিগকে উৎসবে নিমন্ত্রণ করিতেন। ঠাকুর প্রায় প্রতি বৎসরই সেই উৎসবে যোগ দান করিতেন। সেখানে তাঁহাকে দেখিতাম—শিষ্য পরিবেষ্টিত ঋষির ন্যায় উজ্জ্বল মূর্ত্তি। হেমেন্দ্রবাবু খুব শ্রদ্ধা করিতেন। দীর্ঘ ৭ বৎসর কাল ঠাকুরকে এইরূপ উৎসবের সময় দেখিতাম মাত্র কখনও কোন কথাবার্ত্তা বলিতাম না। তখন কলিকাতা আসিলে ঠাকুর সুকিয়া ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত গণেশ শ্রীমানির বাড়ীতে থাকিতেন, এবং অন্যান্য সময়ে কাশীধাম না হয় চন্দন নগর থাকিতেন।

এই সময়ের মধ্যে আমার একটী দিনও দীক্ষা লইবার ইচ্ছা হয় নাই। ধর্ম্ম কার্য্যের মধ্যে কেবল আমার রোজ প্রাতঃকালে গঙ্গা স্নান করিবার অভ্যাস প্রায় ১৯১০ সাল হইতে আরম্ভ হইয়াছিল এবং আজ পর্য্যন্ত

সমান ভাবে আছে। ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত একটা লক্ষ্যহীন জীবন যাপন করিতেছিলাম, ধর্ম্মের কোনও বন্ধন ছিল না, কেবল আদালতের কাজকর্ম্ম, খোস গল্প, অবসরের সময় তাশ পাশা খেলা, মধ্যে মধ্যে থিয়েটার দেখা, সংসারের টানাটানি, চিত্তের বিকার ইত্যাদিতে জীবন একঘেয়ে বোধ হইত। ভিতরে বিষম জ্বালা হইত—মধ্যে মধ্যে পাপ কার্য্যের জন্য অনুতাপ হইত—কিন্তু কি উপায়ে যে প্রাণে শান্তি পাওয়া যায়, তাহার কোনও চিন্তা মনে আসিত না। ঠাকুরকে প্রতি বৎসর একবার করিয়া দেখি মাত্র, কিন্তু তাঁহার নিকট যে প্রাণের এইরূপ জ্বালার কোন প্রতিকার হইতে পারে তাহা একবারও মনে হয় নাই—দীক্ষা নিলেও যে শান্তি হইতে পারে তাহাও বিশ্বাস হইত না—সেই দিক দিয়া চিন্তার কোনও স্রোতও নাই—কিন্তু প্রাণের দারুণ জ্বালা কিছুতেই যায় না। তাহা হইলেও দীক্ষার বিশেষ বিরোধীই ছিলাম। এইরূপ অবস্থায় সুদীর্ঘ ৭ বৎসর কাটিল।

দীক্ষা

১৯১৬ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর ৺পূজার কিছু পূর্ব্বে একদিন রাত্রে বিছানায় শুইয়া আছি আমার স্ত্রী আমার প্রকৃতি জানিয়া ভয়ে ভয়ে আসিয়া আমাকে বলিল "তুমি যদি রাগ না কর তাহা হইলে তোমাকে একটা কথা বলি।"

আমি—"কি কথা বলনা।"

স্ত্রী—"আগে অভয় দাও তার পর বলিব।"

আমি—"আচ্ছা।"

স্ত্রী—"আমি ব্রহ্মচারী ঠাকুরের নিকট দীক্ষা লইতে চাই তোমার অনুমতি না লইলে ত দিবেন না"।

আমি—"ব্রহ্মচারী কোথায়?"

স্ত্রী—সুকিয়া ষ্ট্রীটে—

আমি—"তুমি কি করিয়া এই সংবাদ পাইলে। তুমি তো তাঁহার নিকট যাও নাই, বা তোমার সঙ্গেতো তাঁহার দেখা হয় নাই?"

স্ত্রী—"দেখা হয় নাই বটে কিন্তু আমি তাহাকে আমার ইচ্ছা, ধীরেনের (আমার জ্যেষ্ঠতাত ছোট ভাই) দ্বারা জানাইয়াছি—তিনি তাহাকে দিয়া এই সংবাদ পাঠাইয়াছেন যদি তুমি অনুমতি দাও, তবে কাল আমার দীক্ষা হইতে পারে। কাল সকালেই দিনস্থির করিয়াছেন, কেবল তোমার অনুমতি সাপেক্ষ।

আমি—"তোমাদের এত কথা এত কাণ্ড হইয়া গেল আর আমি কিছু জানিতে পারিলাম না এ কি রকম!

স্ত্রী—"কি করিব ? তোমাকে জানাতেই তো সাহস হয়না। তোমার ইচ্ছা না থাকিলেও তোমার অনুমতি হইলেই আমাকে দীক্ষা দিতে পারেন।

আমি—"ধীরেন কি সেখানে প্রায়ই যায় না তুমি পাঠাইয়াছিলে ?"

স্ত্রী—"ধীরেনের তো অনেক আগে দাদা দীক্ষা লওয়াইছেন। তোমার অমত বলিয়া তোমার কাছে গোপন আছে। তাহার দ্বারাই সংবাদ লই।"

আমি—"আমাকে না জানিয়ে এসব কাণ্ড করা মোটেই ভাল হয় নাই। দীক্ষা লওয়ার কি উপকার কিছুই জানিনা। এ বিষয়ে কিছুই ভাবি নাই এত তাড়াতাড়ি ওসব হয় না।"

স্ত্রী। তাড়াতাড়ি কিসের ? তুমি ত আর নিবেনা, আমাকে অনুমতি দিতে আপত্তি করিতেছ কেন ?

আমি—আমার বাবা মার অনুমতি না নিলে দীক্ষা হইতে পারে না।

স্ত্রী—খুব পারে, কেন না সৎগুরুর নিকট দীক্ষা নিতে কারো অনুমতির দরকার হয় না। তবে তুমি অমত করিলে আর আমার হয় না।

আমি—আমি দীক্ষার বিষয়ে কোন কথা ভাবি নাই। দাদার দেখিতেছি দীক্ষা নিয়া এঁটো বিচারের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হইয়াছে, তুমিও তাই করিবে ত ? ওসব আমি ভালই বাসি না।

স্ত্রী—"তাহা হইলে বুঝিলাম তুমি অনুমতি দিলে না"

আমি—এখন কিছুই বলিতে পারি না রাত্রে তো ঘুমাও সকালবেলা দেখা যাইবে আমি ওসব পছন্দ করি না।"

স্ত্রী নিতান্ত ক্ষুণ্ণ মনে তাহার বিছানায় গিয়া শুইয়া থাকিল। আমি ঘুমাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম কিন্তু আমার কি হইল কিছুতেই আর ঘুম হয় না। জীবনে সেই রাত্রেই প্রথম দীক্ষা লওয়ার প্রয়োজনীয়তা কিছু আছে কিনা বিশেষভাবে চিন্তা করিতে লাগিলাম। দীক্ষার অর্থ কি জানি না। গুরুর আবশ্যকতার বিষয় কখনও ভাবি নাই। সমস্ত রাত্রি নানাপ্রকার

চিন্তায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। স্ত্রী দীক্ষা লইতে চায়, আমি উহার কোনও প্রয়োজন দেখি না। স্ত্রী দীক্ষা লইলে দুইজনের জীবন দুই দিকে ধাবিত হইবে—দাদার সঙ্গে যেমন মনের বিচ্ছেদ হইয়াছে স্ত্রীর সঙ্গেও সেইরূপ হওয়ারই সম্ভব। তাহা হইলে কি লইয়া থাকিব ? এইরূপ নানা চিন্তা করিতে করিতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল। সমস্ত প্রকৃতি স্তব্ধ—আমি একলা শুইয়া আছি—চক্ষে নিদ্রা নাই। শেষরাত্রে একটু তন্দ্রার মত হইল এবং স্বপ্নে দেখিলাম যেন আমি ঠাকুরের সম্মুখে একখানি আসনে বসিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া আছি। অতি প্রত্যূষে বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িলাম, এবং রোজ সকালবেলা যেমন গঙ্গাস্নান করিতে বাহির হইয়া যাই সেইরূপ বাহির হইবার সময় মনে হইল স্নান সারিয়া সুকিয়া ষ্ট্রীটে গিয়া ঠাকুরের নিকট স্ত্রীর দীক্ষার কথা একবার শুনিয়া আসি। ইহা ভাবিয়া বাক্স হইতে ।/০ আনা পয়সা ট্রাম ভাড়া লইয়া স্ত্রীর ঘুম ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই বাহির হইয়া পড়িলাম।

তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া ৭৷৷০টার সময় সুকিয়া ষ্ট্রীটে পৌঁছিলাম। ঠাকুরের নিকট খবর পাঠাইলাম আমাকে তেতালার উপর খোলা ছাদে জানালার কাছে লইয়া গেল। দেখিলাম ঠাকুর তেতালার ঘরের ভিতর আসনে বসিয়া আছেন—সম্মুখে হোমের কুণ্ড মধ্যে কাঠ ইত্যাদি সাজান রহিয়াছে কিন্তু তাহাতে অগ্নি সংযোগ হয় নাই—ঠাকুর একটী দেশালাইএর বাক্স হাতে করিয়া অগ্নি সংযোগের চেষ্টা করিতেছেন।

আমাকে দেখিয়াই যেন চির পরিচিতের ন্যায় বলিলেন "জিতেন, আসিয়াছ ? ওঃ, তোমার স্ত্রীর তো আজ দীক্ষা হইবার কথা ছিল—আমি তো একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছিলাম তাহাকে লইয়া আসিয়াছ ?"

আমি। না এখনও আনি নাই।

ঠাকুর। তাহা হইলে কখন আনিবে?

আমি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম

"আমারও দীক্ষা হয় না?"

কথাটা যে বিশেষ ভাবিয়া বলিয়াছিলাম তাহা নয়। এইরূপ ভাবে যে দীক্ষা লইতে চাহিব তাহা কখনও পূর্ব্বে জানি নাই। পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও দীক্ষার কোনও প্রয়োজনীয়তা মনে হয় নাই। ঐ সম্বন্ধে আগ্রহ তো একেবারেই হয় নাই। কথাটা যেন হঠাৎ কেমন করিয়া মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল। দীক্ষা প্রার্থীরা কি ভাবে দীক্ষা প্রার্থনা করে জানি না। কাহার কিরূপ আগ্রহ তাহাও জানি না। ঠাকুর দীক্ষা দিতে চাহিলেও লইব কিনা জানিনা। হঠাৎ কেন যে বলিলাম তাহা আজ পর্য্যন্তও জানি না। আমাকে আমার অজ্ঞাতে যেন কেহ বলাইল—

"আমারও হয় না"

ঠাকুর এক মিনিটকাল আমার মুখের দিকে ভাল করিয়া তাকাইলেন এবং বোধ হইল যেন আমার কেশ হইতে পদাঙ্গুষ্ঠটী পর্য্যন্ত বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলেন এবং একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন **"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমারও হইবে—তবে সময় বড় অল্প—৯টার মধ্যে যদি এখানে তোমার স্ত্রীকে লইয়া আসিতে পার তবেই হয়। উহার পর ভাল সময় নাই।"**

আমি। সময়তো বড় কম, আর একটী ৬ মাসের শিশু লইয়া আসা মুস্কিল, যাহা হউক দেখি কি করিতে পারি।

ইহা বলিয়া সেখান হইতে বাহির হইলাম এবং স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় ট্রামে উঠিয়া ধর্ম্মতলার মোড়ে আসিয়া একখানা ফার্ষ্ট ক্লাস ফিটন ভাড়া করিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম। স্ত্রী জানালায় দাঁড়াইয়াছিল, আমাকে গাড়ী করিয়া আসিতে দেখিয়া অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি হইয়াছে?"

আমি। "শীঘ্র চল, গাড়ী প্রস্তুত, আর কথা বলিবার সময় নাই— সুকিয়াষ্ট্রীটে ৯টার সময় আমাদের দীক্ষা হইবে।

স্ত্রী—সে কি? আমি ভাবিতেছি তুমি কোথায় গেলে? দীক্ষার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল। আমি তবে গোছাইয়া লই।

আমি। এখন কথা বলার সময় নাই ৯টার মধ্যে সেখানে পৌছিতে হবে, শীঘ্র কাপড় পরিয়া লও। সে আর কোনও কথা না বলিয়া ছোট মেয়েটীকে কোলে লইল, চাকরটীকে ও বড় ছেলে দুটীকেও সঙ্গে লইয়া দুই মিনিটের মধ্যেই গাড়ীতে আসিয়া উঠিল। উভয়ে গাড়ীতে বসিয়া আছি, কেহ কাহারও সঙ্গে কোন কথা বলিতেছি না—স্ত্রীও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইতেছে না।

গাড়ী খুব জোরে হাঁকাইয়া ৯টার মধ্যে সুকিয়া ষ্ট্রীটে পঁহুছিয়া দিল। আমরা একেবারে তেতালার ঘরে গেলাম। এতক্ষণ যেন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া সকল কার্য্য করিলাম—যেন আমার নিঃশ্বাস ফেলিবারও অবসর নাই। যেন আমার নিজের ইচ্ছা বা শক্তিতে (যাহার উপর এতদিন এত বিশ্বাস ছিল) কিছুই করিতেছিনা—যেন আমাকে জোর করিয়া কেহ এই সকল করাইতেছে।

ঘরে ঢুকিয়াই দেখি চারিখানা আসন পাতা আছে। মধ্যখানে একটী পরদা। ঠাকুর সাম্‌নে একখানি আসনে বসিয়া আছেন। খুব ধুপধুনার গন্ধ উঠিয়াছে। একটী তুলসি গাছ আসনের সাম্‌নে আছে। ঠাকুর চক্ষু বুজিয়া নানাপ্রকার স্তোত্রাদী পাঠ করিতেছেন এবং ভাবাবেশে ঢুলিয়া পড়িতেছেন। ইসারায় আমাকে একখানি আসনে বসিতে বলিলেন আর একখানিতে কানাই দাদা বসিল। পরদার আড়ালে আমার স্ত্রী বসিল।

ঠাকুর তৎক্ষণাৎ দীক্ষা আরম্ভ করিলেন। আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। এতকাল দাদার সঙ্গে বাস করিয়াছি কিন্তু এই দীক্ষা সম্বন্ধে

আমার কোন ধারণাই ছিল না শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম জপ কাহাকে বলে তাহা কখনও কল্পনাও করি নাই।

ঠাকুর একেএকে বিধি নিষেধগুলি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন—

প্রত্যেকটী অক্ষর যেন কানের ভিতর ঢুকিয়া গেল। জীবনে কত বক্তৃতা, কত উপদেশ শুনিয়াছি কত পুস্তকে কত উপদেশ পড়িয়াছি, কিন্তু তাহা অতি সহজেই ভুলিয়া গিয়াছি—কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই জলদ গম্ভীর স্বর কানে বাজিয়া উঠে কেন? গুরু মুখের সেই সকল উপদেশ অমান্য করিতে গেলে পেছন দিক হইতে যেন কেহ টানিয়া ধরে?

তারপর নামের প্রতীক্ষায় রহিলাম। ভাবিলাম ভগবানের অনন্ত নামের মধ্যে কি নাম যেন পাই। নামটী পাওয়া মাত্রই যেন বড় মধুর বলিয়া বোধ হইল—যেন চিরপরিচিত নাম মনে হইল।

ইষ্টনাম "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল"—প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে নাম করিবার অভ্যাস করিতে হইবে বলিয়াছিলেন, এবং কিরূপভাবে উহা করা যায় তাহাও দেখাইয়া দিলেন, আমি অবাক হইলাম, তাহার পর প্রাণায়াম দেখাইয়া দিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে "জয়গুরু" "জয়গুরু" বলিতে লাগিলেন। চক্ষু দুইটী মুদ্রিত—ভাবে বিভোর—যেন পরম আনন্দে আপ্লুত—নিজে যাহা আস্বাদ করিয়াছেন তাহা অন্যকে বিলাইয়া দিয়া যেন কত আনন্দ! দীক্ষা সমাপ্তি হইল, গুরুগৃহে আহারাদি করিয়া ঠাকুরের কাছে গিয়া বসিলাম—সে কি আদর ও যত্ন! তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। সেইদিন হইতে জীবনের একটী পাতা উল্টাইয়া গেল। নববজীবন পাইলাম।

১৯১৩ সাল

নামের মহত্ত্ব

দীক্ষার পর প্রায় তিন সপ্তাহ কাল ভাবাবিষ্টের ন্যায় কাটাইতে লাগিলাম। থাকিয়া থাকিয়া নিজের অজ্ঞাতসারে কখন যে নাম শ্বাস প্রশ্বাসের মধ্যে ঢুকিয়া যায় বুঝিতে পারিতেছি না। পথে চলিতে চলিতে, খাইতে, বসিতে, শুইতে, সময়ে, অসময়ে দেখি আপনা হইতেই ভিতরে নাম চলিতেছে। দাদা তখন C. P. তে ছিলেন, তিনি শুনিয়া বড় আনন্দিত হইয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চিঠি লিখিলেন। ঠাকুরও অনেককে বলিলেন "জিতেনের দীক্ষা বড়ই আশ্চর্য্য। আসে পাশে কত লোক ৬ মাস যাবৎ দীক্ষাপ্রার্থী হইয়া অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে তাহাদের এখনও সময় হইল না, আর জিতেনের ভাগ্যে আসিবা মাত্রই হইয়া গেল।" দীক্ষার পরদিন হইতেই ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হইলাম। যখনই অবসর পাই তাঁহার কাছে যাইতে ইচ্ছা করে, এবং প্রায় প্রতিদিন যাইতে লাগিলাম। ঠাকুর বলিলেন "নারদ ঋষি ধ্রুবকে যে নাম দিয়াছিলেন, তোমরা সেই নামই পাইয়াছ। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, সকলেই এই নামে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, তোমরা অতি দুর্ল্লভ সাধন গোঁসাইএর কৃপায় লাভ করিয়াছ। এখন খুব মনোযোগ দিয়া সাধন ভজন করিতে থাক।"

ব্যবসায়ে উন্নতি চিন্তা

ব্যবসায়ে চরম উন্নতি লাভ করিয়া বিশেষভাবে ধনী হইবার একটা আকাঙ্ক্ষা খুব বেশী ছিল, এবং জীবনের উদ্দেশ্যই ছিল যাহাতে খুব বড় উকীল হইতে পারি। দীক্ষা লইবার পর হইতেই মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলাম, যত দূর সাধ্য সৎভাবে জীবন যাপন করিব। তাহাতে মনে মনে একটী প্রচ্ছন্ন আশাও ছিল যে, ইহাতে সাংসারিক উন্নতিও হইতে পারে; একদিন ঠিক ঐরূপ ভাব লইয়া ঠাকুরের নিকট গিয়া বসিলাম—অনেক লোক ছিল, ঠাকুর সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। একটু পরে আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—

"জিতেন, সাধন ভজন করিয়া যাইতেছ তো? বেশ ভাল করিয়া সাধন ভজন কর। খুব বড় লোক না হইলে কি হয়? দু-মুঠা খাবারের অভাব হইবে না" আমি কিন্তু চুপ করিয়া ছিলাম, একটী কথাও বলি নাই। মনে মনে বড়ই আশ্চর্য্য হইলাম ঠাকুর আমার অন্তঃস্থলের চিন্তার ধারা কি প্রকারে জনিলেন? আমি আজ তো মনে মনে সাধন ভজন করিলে বড় লোক হওয়া যাইতে পারে, ঠিক এইরূপ চিন্তাই করিতেছি! ঠাকুর কি তবে আমার ভবিষ্যৎ জীবন দেখিয়াই বলিলেন যে আমি কোন দিন বড় লোক হইতে পারিব না। বহুদিন ঠাকুরের ঐ কথা গুলি ভাবিয়াছি, এবং আজ জীবনের অপরাহ্নে আসিয়া দেখিলাম, সত্যাই ঠাকুর আমার জীবনের ভবিষ্যৎ চিত্র দেখিয়াই আমাকে তখন হইতেই সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যেন বৃথা মিথ্যা আশার পোষণ করিয়া আসল কার্য্যের ক্রটী না করি।

সাধন বৈঠক

তখন প্রতি বুধবার সুকিয়া ষ্ট্রীটে সাধন বৈঠক হইত। অনেক গুরু ভ্রাতা আসিতেন। ঠাকুর নিজেও বৈঠকে আসিয়া আমাদের সঙ্গে বসিতেন। ঠাকুর আমাকে বলিলেন "প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত বৈঠকে আসিও তাহাতে যেন বাধা না হয়।"

আমি প্রতি বুধবার বৈঠকে যাইতে লাগিলাম। প্রথম প্রথম প্রাণায়াম করিতে বড়ই কষ্ট হইত—বুক যেন ব্যথা হইয়া যাইত। ঠাকুর প্রাণায়ামের উপর অত্যন্ত জোর দিতেন এবং প্রায়ই বলিতেন "প্রাণয়ামটী অত্যন্ত আবশ্যকীয়—উহা দ্বারা ভিতরের সমস্ত গলদ পরিষ্কার হইয়া যায় শরীর সুস্থ থাকে।" "নাস্তি প্রাণায়ামাৎ বলং।" বৈঠকের সময় ঠাকুর আমার অতি নিকটে বসিয়া আমার পেটে হাত দিয়া ভাল করিয়া প্রাণায়াম প্রণালী দেখাইয়া দিতেন। এক মাসের মধ্যে উহাতে বেশ অভ্যস্ত হইলাম।

তীর্থ ভ্রমণ

বাল্যকাল হইতেই আমার ভ্রমণের ইচ্ছা বড়ই প্রবল। বহুদিন হইতেই একবার তীর্থ ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে—এবার পূজার ছুটীতে বাড়ী যাইয়া পিতৃদেরের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির হইল, একাদশীর পর দিন আমরা সকলে কাশী বৃন্দাবন হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিতে বাহির হইব। আমরা সকলে প্রথম কাশী হইয়া অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ,

হরিদ্বার, দেরাহুণ, মুশৌরী, দিল্লী আগ্রা প্রভৃতি স্থান দেখিয়া আবার কাশী হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। বৃদ্ধ ও রুগ্ন পিতা, মাতা, স্ত্রী, শিশু কন্যা, পুত্রদের লইয়া নির্ব্বিঘ্নে ও সুচারুরূপে এই পর্য্যটন সম্পন্ন হইল—পথে একটী দিনের জন্যও কোন অসুবিধা হয় নাই। ইহা ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ বলিয়া বার বার মনে হইতে লাগিল। বিশেষতঃ দীক্ষার অতি অল্প কাল মধ্যে এইরূপ ভাবে তীর্থ দর্শন হওয়ায় বড়ই আনন্দ হইল। এই জন্যই এই সামান্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করিলাম, নতুবা ভ্রমণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে নয়। সমস্ত কর্ম্ম সাধন অনুগামী করিবার প্রবৃত্তি যাহাতে জন্মে তাহার চেষ্টা করিতে ইচ্ছা হইল। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি ঠাকুর কলিকাতায় আসিলেন। দীক্ষার ঠিক ৬ মাস পরে ঠাকুরের সঙ্গে এই প্রথম সাক্ষাৎ; আমাকে দেখিয়াই ঠাকুর হাসিমুখে এবং অত্যন্ত স্নেহভরে বলিলেন—

"জিতেন কেমন আছ! বেশ ভালই আছ বলিয়া বোধ হইতেছে"

আমি। আপনার আশীর্ব্বাদে ভালই আছি। এবার ৺পূজার পর আমরা সকলে মিলিয়া তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি তাহাতে মনে বড় আনন্দ পাইয়াছি।"

ঠাকুর। "বাঃ বাঃ বড় ভাল হইয়াছে। কোথায় কোথায় গিয়াছিলে।"

আমি সমুদয় বর্ণনা করিলাম এবং বলিলাম "এত ভ্রমণ করিয়াছি কিন্তু কোথাও আমাদের বিন্দু মাত্রও অসুবিধা হয় নাই—মনে হইয়াছে যেন সর্ব্বদা কে আমাদের রক্ষা করিয়াছেন।" ঠাকুর একটু হাসিলেন।

ঠাকুরের গুরুনিষ্ঠা

১৯১৭ সাল এপ্রিল মাস—আলীপুরের সরকারী উকিল হেমেন্দ্রবাবু তাঁহার মনোহরপুকুর বাগানে একটী প্রকাণ্ড মন্দির তৈয়ারী করাইতে-ছিলেন, এবং তাহার মধ্যে গোঁসাইএর মূর্ত্তি স্থাপিত করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। মন্দির তৈয়ারী প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছিল। প্রথমে বিলাত হইতে বহু অর্থব্যয়ে একখানি মর্ম্মরের মূর্ত্তি তৈয়ার করাইয়া আনিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ঠিক না হওয়ায় কৃষ্ণনগর হইতে প্রসিদ্ধ কারিকর আনাইয়া মৃণ্ময় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া উহারই ছাঁচে ঢালিয়া অষ্টধাতুর মূর্ত্তি স্থাপিত করিবেন এইরূপ সঙ্কল্প ছিল। হেমেন্দ্রবাবু মধ্যে মধ্যে আমাকে কাছারী হইতে বাগানে লইয়া যাইতেন, একদিন তিনি বলিলেন—

"জিতেন, চল বাগানে যাই, আজ তোমার গুরুদেব সেখানে আস্‌বেন"—

আমি উৎফুল্লচিত্তে তাঁহার সঙ্গে বাগানে গিয়া খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিতেই দেখিলাম, অচ্যুৎ দাদার সঙ্গে ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমাকে দেখিলেন—একটু হাসিলেন মাত্র, কিছুই বলিলেন না।

যে ঘরে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ হইতেছিল ঠাকুর সেই ঘরে যাইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ কার্য্য দেখিতে লাগিলেন, এবং হেমেন্দ্রবাবুর সঙ্গে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে কারিকরের সঙ্গেও মূর্ত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। কিছু পরে কারিকরের হাত হইতে যন্ত্রটী লইয়া নিজেই মূর্ত্তির মুখের খানিকটা মাটি কাটিয়া ফেলিলেন—আশ্চর্য্য এই যে তাহাতে যেন গোঁসাইএর মুখখানি পরিস্ফুট হইল। দেখিয়া হেমেন্দ্রবাবু বড়ই আনন্দিত হইয়া ঠাকুরকে বলিলেন।

"ব্রহ্মচারী, আপনি যে কৃষ্ণনগরের কারিকরকে হার মানাইলেন"

ঠাকুর একটু গম্ভীর হইয়া ছলছল চোখে বলিলেন "দেখুন, গোঁসাই-এর মূর্ত্তি এক মুহূর্ত্তের জন্যও চক্ষুর অন্তরাল হয় না—ঐ স্থানটী দেখিয়া আমার মনে হইল ঠিক হয় নাই—তাই যন্ত্র হাতে লইয়া তাঁর মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া যন্ত্র চালনা করিয়াছি।

কি অদ্ভুত গুরুনিষ্ঠা!

১৯১৭ সালের পুরীতে গোঁসাইএর তিরোভাব উৎসব

জৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে গোঁসাইএর তিরোভাব উৎসব প্রতি-বৎসর পুরীধামে সম্পন্ন হয়। ঠাকুর পুরীতে গোঁসাইএর সমাধি-মন্দিরের পার্শ্বে বহু জায়গা লইয়া একটী আশ্রম নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন ; তখন সমুদ্র তীরে "সিন্ধুনিবাস" নামক বাটীতে থাকিতেন। এপ্রিল মাসের প্রথমেই পুরী আসিলেন, এবং ২৪শে এপ্রিল ১১ই বৈশাখ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন আশ্রমে গৃহপ্রবেশ করিলেন চিঠি পাইলাম। উৎসব ১৮ই মে হইবে বলিয়া তাড়া-তাড়ি অসম্পূর্ণ অবস্থায় আশ্রমে গৃহপ্রবেশ করিলেন। আমার উৎসবে যাওয়ার জন্য বড়ই আগ্রহ হইল। আজ পর্য্যন্ত পুরী যাওয়া হয় নাই, এবং জগন্নাথদেবের দর্শন ভাগ্যে ঘটে নাই—একসঙ্গে গুরুগোবিন্দ দর্শন করিব বলিয়া পুরী যাওয়ার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। তখন আমি বাটীতে একলা আছি—স্ত্রীও ছেলেপেলে পিতৃদেবের নিকট ছিল। ১৭ই মে মান্দ্রাজ মেলে রওনা হইয়া ১৮ই মে বেলা ৭টার সময় আশ্রমে পহুঁছিবামাত্রই দেখি, সম্মুখে ঠাকুর দাঁড়াইয়া আছেন। সাষ্টাঙ্গ দিতেই ঠাকুর কুশল প্রশ্ন করিয়া বলিলেন

"জিতেন, তুমি এক্‌লাই আসিয়াছ? তোমার স্ত্রীকে আনিলেনা কেন?

আমি। তাহারা এখন কলিকাতায় নাই বলিয়া আমি এক্‌লাই আসিয়াছি।

ঠাকুর। যাক্ বেশ হইয়াছে। ভালই করিয়াছ, যাও বিশ্রাম কর গিয়া।

গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া সমুদ্র স্নান করিতে গেলাম। তখন আশ্রম দোতালা হয় নাই একতালারও মাত্র কয়েকখানি কাম্‌রা তৈয়ারী হইয়াছে। সমুদ্রস্নান করিয়া জগন্নাথ দর্শন করিয়া সমাধিমন্দিরে আসিয়াই দেখি রেবতীকাকা কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন—মন্দির ভেদ করিয়া খোল করতালের ধ্বনি উঠিল। আমি ইতিপূর্ব্বে খোল-করতালের বাজনা শুনিতে পারিতাম না এবং উহা লইয়া অনেক বিদ্রূপও করিয়াছি। ঠাকুর আমাকে দেখিয়া কীর্ত্তন শুনিতে বলিলেন। আমি জগমোহনে বসিয়া প্রায় ১॥০টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন শুনিলাম। রেবতীকাকা "মাথুর" গাহিয়াছিলেন, অত্যন্ত মধুর লাগিল। ইহার পূর্ব্বে এতক্ষণ ধরিয়া কীর্ত্তন কখনও শুনি নাই। কিন্তু আজ বড়ই ভাল লাগিল—সন্ধ্যার সময় প্রায় ১২।১৩ শত দরিদ্রনারায়ণ ও ব্রাহ্মণদের ভোজন করান হইল। ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলাম। সে এক অপূর্ব্ব দেখিবার জিনিষ—পরম তৃপ্তিতে সকলে আহার করিতেছে। প্রত্যেকের কাছে যাইয়া ঠাকুর দেখাশুনা করিতে লাগিলেন এবং সকলকে পরিতোষ করিয়া ভোজন করাইতে লাগিলেন। ঠাকুরের গুরুভাইদেরও কি উৎসাহ দেখিলাম। অনেকের সঙ্গে আলাপ হইল।

পরদিন সকালে ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত কিরণচাঁদ দরবেশ মহাশয় চা পান করিতেছেন দেখিয়া সেখানে গিয়া বসিলাম। দরবেশ কাকার সঙ্গে ঠাকুর আমার পরিচয় করিয়া দিলেন এবং অনেকক্ষণ বসিয়া নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা হইল। রেবতী কাকা আজও কীর্ত্তন করিলেন। সন্ধ্যার গাড়ীতে

কলিকাতা ফিরিয়া যাইব বলিয়া ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম এবং বলিলাম—

"আমি এখনই যাইব। আজ না গেলে সোমবার কাছারী করিতে পারি না। বড়ই ভাল লাগিল।

ঠাকুর বলিলেন **"আচ্ছা বেশ যাও, যাহা যাহা দেখিলে প্রফুল্লকে (আমার স্ত্রী) সকল কথা বলিও, তাহারও এখানে আসিতে হইবে"**

এই প্রথম ঠাকুরের সঙ্গলাভ হইল। গত রাত্রে ঠাকুর বারান্দায় শুইয়াছিলেন, আমরাও সকলে তাঁহার আশেপাশে যে যেখানে পারি শুইয়াছিলাম। শেষ রাত্রে ঠাকুর উঠিয়া শৌচাদি সারিয়া মধ্যের হল ঘরে হোম করিতে লাগিলেন—আমরাও সকলে চতুর্দ্দিকে আসনে বসিলাম, হোম অন্তে ঠাকুরের সঙ্গে অর্দ্ধঘণ্টা প্রাণায়াম করিলাম। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই আঠার নালায় ঠাকুরের সঙ্গে সকলে স্নান আহ্নিক সারিলাম। ঠাকুর স্নানের পর ঠাকুরঘরে আসিয়া পূজাপাঠ করিলেন—আমরা সকলে শুনিতে লাগিলাম। এইরূপ আনন্দে ২দিন একরাত্রি ঠাকুরের সঙ্গে কাটাইয়া আবার আমার নিরস কর্ম্মজীবনের মধ্যে আসিলাম।

দুঃস্থা বিধবা গুরুভগ্নার দুঃখে ঠাকুরের কাতরতা।

আমাদের একটী বৃদ্ধা গুরু ভগ্নী বড়ই ক্লেশে দিন কাটাইতে ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র বহুদিন হইল কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে আর তাহার কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। গুরু ভগ্নিটী তাঁহার ভাশুরের আশ্রয়ে ছিলেন, ক্রমে ঠাকুরের চরণ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাশুর তাহার সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করিত—এমন কি খোরাক পোষাক না দিয়া গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়াছিল। ঠাকুর তাহাকে পুরীতে আশ্রয় দিলেন। উৎসবের সময় তিনি পুরীতেই ছিলেন। ঠাকুর সেই সময় আমাকে তাহার বিষয় সমুদয় বলিলেন এবং তাহার একটা বিধি ব্যবস্থা করিয়া দিবার ভার আমার উপর দিলেন, এবং আমাকে বলিলেন যেন আমি গিয়া তাঁহার ভাশুরের সঙ্গে দেখা করিয়া যাহাতে আপোষে তাহার জন্য একটা খোরপোষের বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারি তাহা করি—যদি আপোষে না হয় তাহা হইলে আদালতের সাহায্য পর্য্যন্ত লইতে উপদেশ দিলেন।

আমি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার ভাশুরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতে লাগিলাম। ঠাকুর তখন পুরী হইতে আমার নিকট এই বিষয়ে ৩।৪ খানা চিঠী লিখিলেন। তাহার জন্য কত কাতরই না হইয়াছেন এক খানিতে লিখিলেন—

"মোক্ষদার জন্য আমি বড়ই উদ্বেগ ভোগ করিতেছি, তুমি কতদূর কি করিলে আমাকে জানাইবে।" ঝুলন পূর্ণিমাতে গোঁসাইএর জন্মোৎসব উপলক্ষে ঠাকুর আগষ্ট মাসের প্রথমেই কলিকাতায়

সুকিয়া ষ্ট্রীটে আসিলেন—সেইখানে খুব ধুমধামের সহিত উৎসব হইল। গণেশ দাস কীর্ত্তনীয়া ৩।৪ দিন কীর্ত্তন করিলেন। ঠাকুরের বহু গুরু ভ্রাতা উৎসবে আসিতেন। উৎসবের পরেই ঠাকুর আবার পুরী চলিয়া গেলেন, যাইবার পূর্ব্বে আমাকে একদিন ডাকিয়া মোক্ষদা দিদির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম যে উহারা মাম্‌লা না করিলে এক পয়সাও দিবে না।

ঠাকুরের তাহার জন্য যেরূপ উদ্বেগ ও কাতরতা দেখিলাম তাহাতে আমাদের উপর তাঁর যে কি অগাধ স্নেহ তাহা অনুভব করিলাম। পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু ইত্যাদি সকলের সমগ্র স্নেহের সমষ্টি যেন তাঁহার মধ্যে রহিয়াছে। আমি পরিষ্কার বুঝিলাম তিনি একাধারে আমাদের সব।

ঠাকুর বলিলেন "দশ টাকার কম মাসোয়ারাতে কিছুতেই রাজা হইও না। মাম্‌লা না করিয়া আপোষে হইলেই ভাল, যদি আপোষ না হয় অগত্যা মাম্‌লা রুজু করিও—আমার বিশ্বাস মাম্‌লা করিলেই মিটাইয়া লইবে।"

সেপ্টেম্বর মাসে মাম্‌লা সত্যসত্যই রুজু করিতে হইল, এবং বাস্তবিকও সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ভাশুর আমার কাছে আসিয়া মাসিক ৮৲ টাকা মাসোয়ারা দিয়া মোকর্দ্দমা মিটাইতে আমার খোসামুদী করিতে লাগিল। আমি ঠাকুরকে সব লিখিলাম। ঠাকুর এই বিষয়ে একমাসের মধ্যে আমাকে ৫ খানি চিঠী লিখিয়াছিলেন—শেষ চিঠীতে লিখিলেন "মোক্ষদার জন্য বড় উদ্বেগে আছি উহার কার্য্য শীঘ্র হইয়া গেলে শান্তি পাই।" বেশ বুঝিতে পারিতাম প্রত্যেক চিঠীতে ঠাকুর এই দুঃস্থা বিধবার জন্য কতদূর কাতর হইয়াছিলেন। শেষে আশ্চর্য্যের বিষয় ঠাকুরের ইচ্ছায় তাহার ভাশুর অতি সহজেই ১০৲ টাকায় রাজী হইয়া মোকর্দ্দমা মিটাইয়া লইল। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় যে একমাস যাইতে না যাইতেই মোক্ষদা

কলেরায় মৃত্যু হইল—এক মাসের খোরপোষের টাকাও তাহার ভাণ্ডরের দিতে হইল না। বোধ হয় এইরূপ ব্যবস্থা না হইয়া তাহার মৃত্যু ঘটিলে তাহার আত্মার তৃপ্তি হইতনা বলিয়াই ঠাকুর এত অস্থির হইয়াছিলেন। যাহার জন্য ঠাকুরকে এত উদ্বেগ ভোগ করিতে দেখিয়াছি, কার্য্য শেষ হইয়া গেলে আর একটী দিনের জন্যও ঠাকুরের মুখে তাহার নাম শুনি নাই। এইরূপ করিয়া ঠাকুর আমাদের প্রত্যেকের মুক্তির জন্য ব্যস্ত থাকেন। আমাদের উপর ঠাকুরের যে কতদূর স্নেহ ও দয়া তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম—আমি ক্রমেই ঠাকুরের উপর আকৃষ্ট হইতেছি। আমার দীক্ষার একবৎসর এইরূপে শেষ হইল। ঠাকুর কলিকাতায় আসিলেই দেখিবার জন্য প্রাণ অস্থির হইত। সর্ব্বদাই তাঁহার স্মরণ করিয়া আনন্দ পাইতাম এবং সাধন ভজন করিয়া বড়ই তৃপ্তি পাইতাম।

১৯১৮ সালে প্রয়াগের পূর্ণকুম্ভমেলা

বৎসরের প্রথম হইতে অর্থাৎ মাঘ মাসে এবার প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভ আরম্ভ হইয়াছে। এই পূর্ণ কুম্ভেই ২৪ বৎসর পূর্ব্বে ১৩০০ সালে গোস্বামী প্রভু কত লীলা করিয়াছিলেন এবং অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া আসিয়াছিলেন। আবার ইহার ১২ বৎসর পরে ঠাকুর এইখানে গিয়া কত সাধু বৈষ্ণব সেবা করিয়াছিলেন—তাহা আমার ভাগ্যে দেখা হয় নাই। কিন্তু গুরু ভ্রাতাদের কাছে শুনিয়া শেষে লিখিয়া রাখিয়াছি। কুম্ভ মেলা দেখিবার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে। সাধু সন্ন্যাসী দর্শন করা, সৎকথা ও সৎ প্রসঙ্গ করার একটা তীব্র উৎসাহ হৃদয়ে জাগিয়াছে। কুম্ভমেলাতে বহু সাধু সন্ন্যাসীর সমাবেশ হয় শুনিয়াছি। হেমেন্দ্র বাবু ৪ বৎসর পূর্ব্বে হরিদ্বারের পূর্ণকুম্ভে গিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট অনেক গল্প শুনিয়াছি,

এবং এবারেও তাহার পরিবারবর্গ ছেলেপেলে প্রয়াগে পাঠাইয়া দিয়াছেন। যদি কোনও প্রকারে যাইতে পারি, তবে থাকিবার অসুবিধা হইবে না। কিন্তু এবার বহু পূর্ব্ব হইতেই সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াছে যে, কুম্ভ মেলায় ভয়ানক ভিড় হইয়াছে বলিয়া কলিকাতা হইতে এলাহাবাদের থার্ড ও ইণ্টার ক্লাশএর টিকিট বিক্রয় বন্ধ। একেতো কোনও দিনই হাতে পয়সা নাই, তাহাকে সেকেণ্ড ক্লাশএর টিকিট কিনিয়া যাওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য, কাজেই নিরুপায় হইয়া পড়িলাম। আমার এই আশা যে একেবারে আকাশ কুসুম তাহা বেশ বুঝিলাম। ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। ঠাকুর তখন পুরীতে আছেন। মাঘ মাস আসিল। পুরাদমে কুম্ভ মেলা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মাত্র ১ মাস উহার অবস্থিতি—১৪ দিন হইয়া গিয়াছে। আর কোনও আশা নাই—হাতে একটীও পয়সা নাই। কিন্তু খুব বেশী আকাঙ্ক্ষা—কি করিব উপায় নাই।

৯ই মাঘ ২৮শে জানুয়ারী রাত্রে হঠাৎ আমার একটী ভদ্রলোক মক্কেল আসিয়া বলিল যে লক্ষ্ণৌ কোর্ট হইতে তাহার কতকগুলি পুরাতন নথিপত্র আনিতে হইবে। এটর্ণীরা তাহার জন্য ১০০০৲ দাবী করিতেছে। অত টাকা ব্যয় করিতে পারে না, অথচ উহা তাহার অত্যন্ত দরকারী। আমার সঙ্গে এই বিষয়ে পরামর্শ করিতে আসিয়াছে। আমি একবার পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌ গিয়াছিলাম—সেখানকার গভর্ণমেণ্ট এড্ভোকেট এর সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল। আমি কি ভাবিয়া হঠাৎ বলিলাম আমাকে মোট ৪০০৲ টাকা দিবেন, আমি উহা আনিতে পারিব। ভদ্রলোকটী তৎক্ষণাৎ রাজী হইলেন এবং ১০০৲ টাকা তখনই অগ্রিম দিলেন। আমি পরদিনই লক্ষ্ণৌ রওনা হইয়া গেলাম। লক্ষ্ণৌ পৌছিয়া গভর্ণমেণ্ট এড্ভোকেট এর সাহায্যে, ১ ঘণ্টার মধ্যে সমুদয় কার্য্য শেষ করিয়া টেলিগ্রাম মণি-অর্ডারএ বাকী টাকা

আনাইয়া লইলাম। আমার কার্য্য শেষ হইয়া গেল। বোধ হয় একখানা চিঠি লিখিয়াও এই কার্য্য শেষ করিতে পারিতাম। ঐবিষয়ে ফয়জাবাদেও একটু কার্য্য ছিল। সেখানে গিয়া তৎপরদিন তাহাও শেষ করিলাম। সেবারে রাত্রে অযোধ্যা ভাল করিয়া দেখিতে পারি নাই বলিয়া, ফয়জাবাদ হইতে অযোধ্যা দেখিতে গেলাম। যাইবার সময় পথে সদ্‌গুরুসঙ্গ বর্ণিত রাণোপালির বিস্তৃত ময়দান দেখিয়া ঠাকুরের ফয়জাবাদ অবস্থানের কথা স্মরণ হইল। এখানে ঠাকুর কতকাল বাস করিয়াছিলেন! এই স্থানেই তাঁহার পদরেণু অনুতে মিশিয়া আছে ভাবিয়া তীর্থ জ্ঞান করিতে লাগিলাম। একা একা নীরব নিস্তব্ধ পথ বাহিয়া অযোধ্যা পঁহুছিলাম। বাস্তবিকও অযোধ্যা কি নীরব—এখনও যেন শ্রীরামচন্দ্রের শোকে সকলে মূহ্যমান। হনুমান গৌরী ইত্যাদি সমুদয় ভাল করিয়া দেখিয়া আবার ফয়জাবাদে পৌছিলাম।

ফয়জাবাদ হইয়া প্রয়াগে কুম্ভমেলা দেখিয়া কলিকাতা ফিরিব। মনে মনে ঠাকুরের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। কত সহজে ঠাকুর আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন ভাবিয়া বড়ই আনন্দ উপভোগ করিলাম। ঠাকুরের কি দয়া!

শেষ রাত্রে ফয়জাবাদ হইতে ট্রেণে উঠিয়া, পরদিন বেলা ১১টার সময় এলাহাবাদে পৌছিলাম। এবং একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া হেমেন্দ্র বাবুর বাসায় গিয়া পৌছিলাম। যাইয়া দেখি উহারা সকলে কুম্ভমেলায় কাঠিয়া বাবার আশ্রমে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। আর ৫ মিনিট পরে আসিলে, কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ হইত না। এবং আমার কষ্টের অবধি থাকিত না—রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। ঠাকুরের দয়ার কথা মনে হইল। প্রতি পদে পদে ঠাকুর আমার সকল রকমে সুবিধা করিয়া দিতেছেন ভাবিয়া বড়ই আনন্দ হইল। ত্রিবেণীতে গিয়া স্নান করিব স্থির করিলাম। উহাদের বাড়ী হইতে ত্রিবেণী প্রায়

৩ মাইল, গাড়ীতে ঐ পথ যাইয়া গঙ্গার চড়ার উপর দিয়া প্রায় ১ মাইল হাঁটিয়া যাইতে লাগিলাম। দূর হইতে জনকোলাহল কানে আসিতে লাগিল। বালুর উপর দিয়া যাইতে যাইতে দুই ধারে অসংখ্য সাধু-সন্ন্যাসী চক্ষে পড়িল। অত বড় বিরাট জনতার বর্ণনা করিবার আমার সাধ্য নাই। চতুর্দ্দিকে শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি, ভজন কীর্ত্তন ইত্যাদি শব্দ কানে আসিতে লাগিল। আমরা কাঠিয়া বাবার আশ্রমে গিয়া পৌছিলাম—সেখানে আজ ভাণ্ডারা—গোস্বামী প্রভুর সকল শিষ্যগণের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। শুনিলাম সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রসাদ পাওয়া যাইবে না। আমি ইতিমধ্যে ত্রিবেণী স্নান করিয়া সাধু-দর্শনের জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম। দেখিলাম একদিকে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়, একদিকে উদাসীন, বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, নানকপন্থী, অঘোরী, নাগা সকলের জন্য আলাদা ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রচণ্ড শীত, ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছে—বিকাল হইতেই বড় বেশী শীত করিতে লাগিল। ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব দেখিতে লাগিলাম। শুনিলাম সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীশ্রীমৎ ভোলাগিরি মহারাজ প্রধান—তিনি গত কুম্ভমেলাতে গোঁসাইকে বড় আদর যত্ন করিয়াছিলেন এবং শ্রদ্ধা সহকারে "মেরা আশুতোষ" "মেরা আশুতোষ" বলিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন দিয়াছিলেন। তাঁহার ছাউনিও দেখিয়া আসিলাম এবং তাঁহাকে দর্শন করিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু শুনিলাম তিনি তখন ওখানে নাই—সন্ধ্যার পর আসিবেন। আরও অনেক সাধু-সন্ন্যাসী দেখিতে লাগিলাম। কতশত সাধু শুধু গায়ে ভস্ম মাখিয়া আকাশের নীচে একটী ধুনি জ্বালিয়া সমস্ত দিনরাত্রি বসিয়া আছেন—আবার কেহ বা শুধু একটী বড় ছাতার নীচে আসন করিয়াছেন। আবার কাহারও কাহারও প্রকাণ্ড আটচালার ছাউনি, পৃথক্ পৃথক্ বাহিরের ও ভিতরের থলট, মখমলের আসন, বাহিরে আস্তাবলে হাতী, ঘোড়া, উট ইত্যাদি বাঁধা রহিয়াছে। ঠাকুরদাস বাবাকে (যিনি "ধুনিয়া বাবা" নামে পরিচিত) একবার

বালীগঞ্জে দেখিয়াছিলাম। তাঁহার ছাউনি খুঁজিতে লাগিলাম। খুঁজিয়া বাহির করাও কষ্ট। একটী প্রকাণ্ড নগরের মত। রাস্তা, ঘাট, দোকান পাট, জলের কল, ময়দান, ইত্যাদি সকলই আছে। ঠাকুরদাস বাবাকে দেখিলাম বসিয়া আছেন—কোন কথাবার্ত্তা বলিলেন না।

অতি বৃদ্ধা একটী পাঞ্জাবী স্ত্রী সাধু দেখিলাম। তাঁহার নিকট গুরুবাদ সম্বন্ধে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি খুব জোরের সহিত বলিলেন সদ্‌গুরুলাভ না হইলে ধর্ম্ম হয় না,—মোক্ষ হয় না। ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইলাম। সন্ধ্যাও হইয়া আসিল, কাঠিয়া বাবার আশ্রমে প্রসাদ পাইবার ঘণ্টাও বাজিতে লাগিল। শতসহস্র লোক গলির মধ্যে বালুর উপর এক একখানা শালপাতা লইয়া বসিয়া গেল। প্রায় ২০০০ লোক প্রসাদ পাইতে বসিল। যাহার ইচ্ছা সেই বসিল—কাহাকেও বাধা দেওয়া হয় না। আহার শেষ হইতে রাত্রি হইয়া গেল। সন্ধ্যার পর কুম্ভের দৃশ্য বড় চমৎকার। চতুর্দ্দিক আলোয় আলোকময়। কোথায়ও সন্ধ্যারতি হইতেছে, কোথায়ও শঙ্খঘণ্টা ধ্বনি, কোনও স্থানে ভজনগান, কীর্ত্তন, ইত্যাদি শুনিয়া ও দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

ঘুরিতে ঘুরিতে আবার গিরি মহারাজের আশ্রমে গেলাম। দেখিলাম তিনি একটী প্রকাণ্ড চন্দ্রাতপের নিচে বসিয়া আছেন—সম্মুখে বহুলোক—আমি একেবারে তাঁহার কাছে গিয়া সাষ্টাঙ্গ দিয়া নিজের পরিচয় দিয়া বলিলাম "মহারাজ, আপনার দর্শন করিতে আসিয়াছি।" আমার পরিচয় শুনিয়া স্নেহভরে মাথায় হাত দিয়া বলিলেন "আরে তু মেরা আশুতোষকা নাতি হ্যায়—হামারা বড় প্রিয়, বেশ্ বেটা বেশ্!" তাহার পর আমাকে কিছু উপদেশ দিলেন—বলিলেন "সদ্‌গুরুর আশ্রয় পাইয়াছ, খুব আনন্দ কর ও সাধন ভজন কর, ভাল হইবে।" তখন প্রসাদ আসিল। গিরি মহারাজ নিজে হাতে করিয়া কয়েকটী পেঁড়া, দরবেশ প্রসাদ আমার হাতে দিয়া বলিলেন "লে বেটা ভকিল, লে, প্রসাদ লে;

খুব আনন্দ "কর্, ভাল হো যায়েগা" আমি নমস্কার করিয়া চলিয়া আসিলাম। রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বাসায় ফিরিলাম।

পরদিন ভোরবেলা উঠিয়া আসিয়া ত্রিবেণীতে স্নান করিলাম এবং গঙ্গার ওপারে ঝুন্সিতে গিয়া গোফার ভিতর কয়েকটী সাধু দর্শন করিলাম এবং সমস্ত দিন ঘুরিয়া দেখিয়া রাত্রের গাড়ীতে রওনা হইয়া কলিকাতা ফিরিয়া আসিলাম। সময় অভাবে কুম্ভমেলা ভাল করিয়া দেখিতে ও বুঝিতে পারিলাম না। একমাস থাকিতে পারিলে হয়তো কিছু বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু এই দুইদিনের অভিজ্ঞতায়, আমার এই ধারণা হইল যে, সংসারে কেবল স্ত্রীপুত্র প্রতিপালন, অর্থ রোজগার, এবং দৈনন্দিন আহারবিহার করা ইত্যাদি ছাড়া, আরও একটী জগৎ আছে এবং যাঁহারা সেই পথের পথিক তাঁহারা পার্থিব সাধারণ আনন্দ ছাড়া অন্য কিছুতে বিশেষ আনন্দ পাইয়া থাকেন, যাহা আমরা ধারণাও করিতে পারি না। ইহা খুব সম্ভব যে, যত সাধু সমবেত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে অনেক ছদ্মবেশী ভণ্ড ও চোর ডাকাত আছে, কিন্তু তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। ভারতে বহু ত্যাগী সন্ন্যাসী লুক্কায়িত আছেন এবং সহজে তাহারা ধরা দেন না এবং লোকালয়ে আসিতে চাহেন না। ভাল জিনিষেরই অনুকরণ হওয়া স্বাভাবিক।

মার্চ্চমাসে ঠাকুর কলিকাতা আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া আমার কুম্ভমেলা যাওয়ার কাহিনী সমুদয় বলিলাম এবং কিরূপে অপ্রত্যাশিতভাবে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে তাহাও জানাইলাম। সকল শুনিয়া তিনি বলিলেন "**বেশ হইয়াছে, খুব ভাল হইয়াছে। যখন যেরূপ ঘটে তাহার মূল জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া লইও। কেবল শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করিয়া যাও। সব ঠিক হ'য়ে যাবে।**"

সাধনে শুষ্কতা। ঠাকুরের আদেশ

কিছুদিন যাবৎ সাধনে একটা নিরুৎসাহ আসিয়াছে। একটা দারুণ শুষ্কতা হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। অর্থের অভাবজনিতও কতকটা বটে, কতকটা মনের চাঞ্চল্য—সাধন ভজনে অনুরাগ কমিয়া গেল—কাহারও সঙ্গে ভাল করিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে পারি না। কেবলই যেন মনে হইতে লাগিল, আমি এই পৃথিবীতে বড়ই একলা। যেন remote, unfriended, melancholy, slow! ঠাকুরের কাছে মাঝে মাঝে যাই বটে, কিন্তু প্রাণে তেমন আনন্দ পাই না।

একদিন বুধবার ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছি। আমাকে দেখিবামাত্রই ঠাকুর বলিলেন "জিতেন, তুমি রীতিমত সাধন বৈঠকে যাও না কেন? বৈঠকে আসা অত্যন্ত দরকার। তা'তে অনেক উপকার হয়। যাও আজ বৈঠকে যাও।"

আমার তখনই মনে হইল ঠাকুর আমার মুখ দেখিয়াই ভিতরের অবস্থা সব বুঝিতে পারিয়াছেন। নীচে বৈঠকে গিয়া বসিলাম—একটু শান্তি পাইলাম।

শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী মল্লিকের দীক্ষা

বঙ্কুবাবু আমাদের কোর্টের উকীল, আমার সঙ্গে তাহার খুব বেশী মাখামাখি না থাকিলেও তাঁহাকে দেখিলেই আমার বড় ভাল লাগিত। ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে, একদিন তাঁহার মধুরায়ের গলির বাড়ীর ধার দিয়া যাইতেছিলাম, তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করিয়া, তাঁহার স্বাভাবিক সুমিষ্ট ব্যবহারে বড়ই প্রীত হইয়াছিলাম। এপ্রিল মাসে একদিন সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিয়া বাহির হইয়াছি, পথে বঙ্কুবাবুর সঙ্গে দেখা হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "জিতেন কোথা থেকে আস্‌চ ?"

আমি। সুকিয়া ষ্ট্রীটে আমার গুরুদেব ব্রহ্মচারী ঠাকুরের কাছে গিয়াছিলাম, সেখান থেকেই আস্‌চি।

বঙ্কুবাবু। আমি তাঁহার নাম শুনিয়াছি দীক্ষা লইয়া কি বেশ ভাল লাগিতেছে ?

আমি। ভালই লাগে। যাহা হয় তবু একটা অবলম্বন হইয়াছে তো !

বঙ্কু। আমার ওসব দিকে বড় বিশ্বাস নাই, তবে একবার তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করে।

আমি। বেশ তো এখনই চলুন না। ইহা বলিয়া বঙ্কুবাবুকে লইয়া ঠাকুরের সঙ্গে আবার দেখা করিলাম এবং তাহাকে পরিচয় করাইয়া দিলাম। ঠাকুর একবার বেশ করিয়া তাহাকে দেখিয়া লইলেন—বিশেষ কিছু বলিলেন না।

২১শে এপ্রিল রবিবার বিকালবেলা ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া জানিলাম, ঐদিন সকালবেলা বঙ্কুবাবু সস্ত্রীক দীক্ষা পাইয়াছেন। দীক্ষার পর হইতে তাহার সাধননিষ্ঠা অনুকরণীয়। পরবর্ত্তী জীবনে বঙ্কুদাদার কাছে বহু উপকার পাইয়াছি। এবং আজ পর্য্যন্তও তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ-সহোদর জ্ঞান করি।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

আগষ্টমাসে ঝুলনপূর্ণিমার জন্মোৎসব তিথিতে এবারও সুকিয়া ষ্ট্রীটে খুব সমারোহের সহিত উৎসব হইল। হেমেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে রেবতী কাকার কীর্ত্তন, ও সুকিয়া ষ্ট্রীটে গণেশদাসের কীর্ত্তন হইল। উৎসবের পর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন (তখনও দেশবন্ধু নাম হয় নাই) মধ্যে মধ্যে ঠাকুরের কাছে যাইতেন। তিনি তখন প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার এবং সর্ব্বত্র "দাশ সাহেব" নামে পরিচিত। ভোগ বিলাসের মধ্যে থাকিয়াও খুব কীর্ত্তনের অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার রসা রোডের বাড়ীতে একদিন গণেশ দাসের কীর্ত্তনে ঠাকুরকে যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। আমরা সকলে ঠাকুরকে লইয়া তাঁহার বাটীতে কীর্ত্তন শুনিতে গিয়াছিলাম। চিত্তরঞ্জন ঠাকুরকে খুব ভক্তি করিতেন।

ঠাকুরের গয়ার পাহাড়ের অবস্থানের কথা

এইবার উৎসবের পর "শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গের" দ্বিতীয়খণ্ড প্রকাশ করিবার জন্য ঠাকুর খুব পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। পুরাতন ডায়েরী হইতে রোজ দ্বিপ্রহরে আবার ভাল করিয়া লিখিতেন। বিকালবেলা আমরা গেলে আমাদের উহা পড়িতে দিতেন। আমরা পড়িতাম, ঠাকুর শুনিয়া যাইতেন। এইরূপ পড়িতে পড়িতে এক একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়া যাইত। ঐ সময়ে একদিন ঠাকুরকে বলিলাম "আপনার গয়ার পাহাড়ে থাকার সময়কার ঘটনা আমাদের কিছু শুনিতে বড়ই ইচ্ছা করে।

ঠাকুর বলিলেন "সে অনেক কথা" এই বলিয়া বলিতে লাগিলেন —তখনই উহা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম—ঠাকুর বলিলেন ঃ—

"গুরুদেবের দেহত্যাগের পর আমি কিছু দিন হরিদ্বারের নিকট পাহাড়ে সাধন ভজনে রত ছিলাম। আমার বড় দাদা ৺হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখন হরিদ্বার সিভিল লাইনএর এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জেন ছিলেন। একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম গুরুদেব আমাকে ৺পুরীধামের সমাধী মন্দির হইতে হাত ইসারা করিয়া ডাকিতেছেন "তুই এখানে আয়।"

আমি তখন উহা গ্রাহ্য করিলাম না। মনে করিলাম স্বপ্ন অলীক মাত্র, যদি তিনি আমাকে সত্য সত্যই পুরী যাইতে আদেশ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে যতদিন না প্রত্যক্ষ দেখা দিয়া আদেশ দিবেন, ততদিন উহা আমি সত্য বলিয়া মানিয়া

লইব না। এইরূপ আরও কিছুদিন গত হইল। আমি আবার স্বপ্ন দেখিলাম, ঠাকুর নরেন্দ্র সরোবর হইতে স্নান করিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জলে সিক্ত, তিনি আমার দিকে তাকাইয়া বলিতেছেন 'আমার কাপড় খানা আনিয়া দাও'। আমি উপর্য্যুপরি দুইবার পুরী যাওয়ার আদেশ পাইয়াও, তাহা গ্রাহ্য করিলাম না। একদিন অন্য মনে এ বিষয়ে এই সকল কথা ভাবিতেছি, এমন সময় হঠাৎ একজন অচেনা লোক আমার অলক্ষ্যে আসিয়া আমার বাম গণ্ডে এক চপেটাঘাত করিল। সর্ব্বাঙ্গে প্রহার করিয়া চলিয়া গেল। আমি প্রহার খাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলাম। কে আমাকে প্রহার করিল জানিতে পারিলাম না। কি জন্য প্রহার করিল তাহাও জানি না। সে ব্যক্তিকেও আর দেখিলাম না। আমি শুইয়া পড়িয়া আছি, এমন সময় এক ভীষন পাহাড়িয়া বিছা আমার বাম পদে দংশন করিল। এই বিছায় কামড়াইলে সর্প দংশনের মত জ্বালা হয়, এবং মানুষ ইহার বিষে মরিয়া যায়। আমি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়া কাটাইতেছি, এবং অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া রহিলাম। বড় দাদা সংবাদ পাইয়া আসিলেন এবং নানা প্রকার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। তিন দিন তিন রাত্রি অক্লান্ত চিকিৎসার ফলে আমি সুস্থ হইলাম। সুস্থ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, কেন আমার এরূপ হইল। তখন ঠাকুরের সেই স্বপ্নের কথা মনে হইল। এবং স্বপ্নের আদেশ অমান্য করার ফলেই যে এইরূপ হইয়াছে, তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম। আমি বড় দাদাকে সমুদয়

অবস্থা বলিলাম। তিনি আমাকে পুরী যাইতেই পরামর্শ দিলেন। আমি সেখান হইতে পুরী রওনা হইলাম।

আমার মেঝ্‌দাদা শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখন গয়াতে ওকালতী করেন। পুরী যাইবার পথে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া যাইবার জন্য গয়ায় নামিলাম, এবং তাঁহার বাসায় গেলাম। দুই এক দিন বিশ্রাম করিয়া পুরী যাইব এইরূপ সঙ্কল্প ছিল। হঠাৎ রাত্রে এক দিন স্বপ্নে দেখিলাম যে ঠাকুর গয়ার নিকটবর্ত্তী একটী পাহাড়ের খানিকটা নির্দ্দিষ্ট স্থান দেখাইয়া দিয়া বলিলেন "এই খানে বসিয়া সাধন ভজন কর"। আমি স্বপ্নে পরিষ্কার একটী স্থানের দৃশ্য দেখিলাম। গয়ার পাহাড়ে আমি পূর্ব্বে কখনও যাই নাই—কিন্তু পরিষ্কার একটী আশ্রম ও তৎসংলগ্ন অনেকটা ফাঁকা জায়গা দেখিতে পাইলাম। পরদিন মেঝ্‌দাদাকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিলাম, এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়া পাহাড়ে গিয়া দেখি স্বপ্নে যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, ঠিক সেইরূপ স্থান বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি এবার আর স্বপ্ন অলীক ভাবিতে পারিলাম না। ঐ খানেই আসন করিয়া বসিয়া পড়িলাম। পুরী আর যাওয়া হইল না।"

এইটুকু মাত্র বলিলেন—অধিক রাত্র হওয়ায় আর কিছু বলিলেন না। এ বিষয়ে আর কোন দিন কিছু জিজ্ঞাসাও করি নাই বা আর কিছু শুনি নাই।

চন্দন নগরে ঠাকুরের সঙ্গ

১৮১৯ সালের প্রথম হইতেই শ্রীরামপুরে একটী মোকদ্দমা করিতে প্রায়ই যাইতে হইত। মার্চ্চ মাসের শেষে দুই দিন ছুটী ছিল, ভাবিলাম শ্রীরামপুর হইতে কাজ সারিয়া চন্দন নগর যাইয়া ঠাকুরের সঙ্গে দুই দিন কাটাইব। হুগলীর উকীল ৺শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমার বিপক্ষে ছিলেন। আমি চন্দন নগর ঠাকুরের কাছে যাইব শুনিয়া তিনি বলিলেন "আমিও আপনার সঙ্গে যাইব। অনেক দিন হইতে আমার ব্রহ্মচারী ঠাকুরকে দেখিবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু এতদিন ঘটিয়া উঠে নাই। আমরা দুই জনে বিকাল বেলা চন্দন নগরে পৌছিলাম। শ্রীশ বাবুর পরিচয় করাইয়া দিলাম। তিনি ঠাকুরকে বলিলেন "আপনার সদ্‌গুরু সঙ্গ" পড়িয়াছি এবং অন্যান্য খণ্ডগুলি পড়িবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিয়াছি। আপনি উহা প্রকাশ না করায় সাধারণকে বঞ্চনা করিতেছেন" ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন "আরম্ভতো করিয়াছি কিন্তু প্রস্তুত করা বড়ই কঠিন এবং সময় সাপেক্ষ। আবার ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া অনেক জায়গায় বাদ দিয়া বাহির করিতে হয়, এই জন্যই দেরী হইতেছে। শ্রীশবাবু অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিয়া হুগলি চলিয়া গেলেন।

আমি দুইদিন চন্দনগরে ঠাকুরের নিরবিচ্ছিন্ন সঙ্গ করিয়া বড়ই আনন্দে কাটাইলাম। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ঠাকুরের সঙ্গে প্রাণায়াম করিয়া গঙ্গাস্নানে বাহির হইয়া পড়িতাম, এবং সমস্ত দিন নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলিতাম।

ঠাকুর একদিন নানাপ্রসঙ্গ করিতে করিতে বলিলেন "আমরা আমাদের এই সকল বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা যাহা বুঝিতে পারি নাই,

তাহাই অগ্রাহ্য করিতে চাই। আমাদের চক্ষুর উপর কতটুকু নির্ভর করিতে পারি? টেলিস্কোপের সাহায্যে খালি চক্ষের চেয়ে বেশী দূর দেখিতে পারি। আবার কেহ কেহ যেমন পেচক ইত্যাদি দিনে কিছুই দেখিতে পায় না রাত্রে দেখে।

"দিবান্ধাঃ প্রাণিনা কেচিৎ রাত্রাবন্ধাঃ তথাপরে" ইহাতে বুঝা যায় আমাদের এই সকল বাহ্যেন্দ্রিয় ছাড়া, আর একটী অন্তরেন্দ্রিয় আছে। তাহার সাহায্যে আমরা অন্যান্য অনেক তথ্য জানিতে পারি। সেই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের বিকাশ না হইলে, ওদিককার খবর জানা সম্ভব নয়।

ঠাকুরের বরিশাল দেবকুমারবাবুর বাটীতে গমন

কবি ৺দেবকুমার রায় চৌধুরী বরিশালের জমীদার ছিলেন। তিনি অতি বাল্যকালে গোস্বামী প্রভুর নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তারপর বহুদিন তিনি এদিককার সঙ্গ ছাড়া ছিলেন। সম্প্রীতি অতি আশ্চর্য্যভাবে তাঁহার স্ত্রীর ঠাকুরের নিকট দীক্ষা হইয়াছিল। ঠাকুরের মুখেই শুনিয়াছিলাম, দেবকুমারবাবু তাঁহার স্ত্রীকে কাশীধামে অন্য কোনও সাধুর নিকট দীক্ষা লওয়াইবার জন্য গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, গোঁসাই ঠাকুরকে দেখাইয়া বলিতেছেন "উঁহার নিকট দীক্ষা লও" তাহাতেই তিনি পুরী যাইয়া স্ত্রীকে ঠাকুরের নিকট দীক্ষা লওয়াইয়াছিলেন। তাহার পর হইতে দেবকুমারবাবু সর্ব্বদাই ঠাকুরের সঙ্গ করিতেন। এবার তাঁহার বরিশালের বাটীতে ঠাকুরকে লইয়া যাইবার জন্য বড়ই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

আগষ্টমাসে ঠাকুর তাঁহার অনুরোধে বরিশাল যাইতে রাজী হইলেন। আমার পিতৃদেব পটুয়াখালীর উকীল ছিলেন। ঠাকুর বরিশাল যাইবেন শুনিয়া আমরাও মনে মনে ইচ্ছা হইল ঠাকুরের সঙ্গে বরিশাল যাইয়া, ওখান হইতে একবার পিতৃদেবকে দেখিয়া আসিব। ঠাকুরের কাছে যাইয়া বসিবামাত্রই তিনি বলিলেন "জিতেন, আমরা ২৫শে আগষ্ট বরিশালে দেবকুমারের বাড়ীতে যাইব, তুমিও আমাদের সঙ্গে চল" আমি তখনই সম্মতি দিলাম। আমরা সকলে ২৬শে আগষ্ট সকালবেলা বরিশাল পঁহুছিলাম। ঠাকুরের সঙ্গে মহানন্দদা, অচ্যুৎদা, জিতুদা ইত্যাদি প্রায় ২৫।৩০টী গুরুভাই গেল। এবং ঠাকুরের গুরুভাই শ্রীযুক্ত

হেমেন্দ্র গুহ রায় মহাশয় ও শ্রীযুক্ত কিরণচাঁদ দরবেশ মহাশয়ও গেলেন। আমি ওখান হইতে আমার মামা বাসণ্ডার জমীদার ৺উপেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের বাসায় গেলাম এবং তৎপরদিন পটুয়াখালী যাইব স্থির করিলাম। বিকালবেলা আমার সঙ্গে মামা ও হিরণ (বাসণ্ডার আর একটী জমিদার) ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। আমি পটুয়াখালী যাইতেছি শুনিয়া ঠাকুর আমাকে বলিলেন—

"জিতেন, পটুয়াখালীর এস্, ডি, ও, কালীমোহন বাবুর স্ত্রী দীক্ষাপ্রার্থী হইয়া আমাকে চিঠি লিখিয়াছিল, এবং পুরী যাইয়া আমার দেখা না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। তুমি কল্যই কালীমোহন বাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া বলিবে, এখানে আসিলে তাহার দীক্ষা হইতে পারে। আমি এখানে ৭।৮ দিন থাকিব।"

পরদিন পটুয়াখালী যাইয়া কালীমোহনবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া ঠাকুরের কথা বলিলাম। কালীমোহনবাবু বলিলেন "আমার স্ত্রী দেবকুমার বাবুর বাড়ী যাইতে পারিবেন না। তিনিই এখানে আসিয়া দীক্ষা দিয়া যাইবেন, আমি টেলিগ্রাম করিয়া দিতেছি। আমাদের দেশের রীতি এই যে গুরুবাড়ীতে আসিয়া দীক্ষা দিয়া থাকেন। আমার স্ত্রীর অন্য জায়গায় যাইয়া দীক্ষা লওয়া সম্ভবপর নহে।"

আমি চলিয়া আসিলাম। তারপর শুনিলাম ঠাকুর যখন টেলিগ্রামের উত্তরে জানাইলেন যে তিনি ওখানে যাইবেন না, তখন কালীবাবুর স্ত্রী দেবকুমারবাবুর বাড়ীতে যাইয়াই দীক্ষা লইয়া আসিলেন। পটুয়াখালী ৩।৪ দিন ছিলাম এবং ওখানে বসিয়াই শুনিলাম হিরণ এবং মামার দীক্ষা হইয়াছে। শুনিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইলাম। মামা বৃদ্ধ হইয়াছেন এবং তাঁহার পূর্ব্ব সংস্কার সমুদয় দীক্ষার বিরোধী ছিল। হিরণও অনেকটা উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির ছিল। কিন্তু দীক্ষার পর হইতে

সে একেবারে অন্য মানুষ হইয়া গিয়াছে। বরিশালে ফিরিয়া আসিয়া একদিন দেবকুমার বাবুর বাড়ীতে ছিলাম। তাঁহার অতিথিসৎকারের তুলনা নাই। প্রায় ১০০ শত লোককে রোজ দুবেলা এই সাতদিন পর্য্যন্ত ২৫।২৬ রকম নিরামিষ তরকারী দ্বারা বাড়ীর মেয়েরা রন্ধন করিয়া, পরিবেষণ করিয়া, পরিতোষরূপে আহার করাইয়াছেন। বরিশালের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রায় প্রত্যহই আসিতেন। বরিশাল হইতে ঠাকুরের সঙ্গে একত্র হইয়া কলিকাতা আসিলাম। ষ্টীমারে প্রথম শ্রেণীর ডেকে, রাত্রে ঠাকুরের পাশাপাশি শুইয়াছিলাম। আমার সঙ্গে সমস্ত রাত্রি কত কথাবার্ত্তা বলিলেন। এইবারই আমার সংসারের সমুদয় সংবাদ ভাল করিয়া জানিয়া লইলেন। দাদা যে আমার জ্যেষ্ঠতাত ভাই জানিতে পারিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "আমার তো ধারণা ছিল তোমরা তিন সহোদর।"

সংসারধর্ম্ম সম্বন্ধে ঠাকুরের চিঠী

এই বৎসর পূজার পর আমার পিতৃদেব কার্য্য হইতে অবসর লইয়া অসুস্থা মাতৃদেবীকে লইয়া কলিকাতা আসিলেন। আমার স্ত্রীর উপর সংসারের সমুদয় ভার চাপিল। ঠাকুরকে পুরীতে স্ত্রী এই সকল সংবাদ দিলেন। ঠাকুর তাহার উত্তরে ২৪।১১।১৯ তারিখের চিঠীতে আমার স্ত্রীকে লিখিলেন।

"সংসারের কার্য্যগুলি সুচারুরূপে করিয়া যাইতে পারিলেই সংসার হইতে অব্যাহতি। এটী সাধন ভজন অপেক্ষা কম নহে। তোমার প্রতি ঠাকুরের বিশেষ কৃপা বশতঃই সংসারের প্রধান কর্ত্তব্যের ভার তোমার উপর পড়িয়াছ। সংসারের কাজকর্ম্ম করিয়া যেটুকু অবসর পাইবে দেহমন সুস্থ থাকিলে সাধন করিবে।"

আবার ৫।১২।১৯ তারিখে লিখিলেন ঃ—

"সংসারের কর্ত্তব্যগুলি যথামত করিয়া অবসর পাইলে সাধন করিবে। চরিতামৃতখানা ভাল করিয়া পড়িও। উহা পুনঃপুনঃ পাঠ করিতে হয়। মহাভারত শেষ হইলে রামায়ণ। এই দুইখানা গ্রন্থ ভাল পড়া থাকিলে অন্য ধর্ম্মগ্রন্থ না পড়িলেও চলে। গ্রহ সংযোগে, বিপ্লব কল্পনার দিনে, সাধন ভজন লইয়া থাকাই ব্যবস্থা। যেমন গ্রহণের সময় করে। সদ্‌গুরুসঙ্গ ২য় ভাগ ১০।১৫ দিনের মধ্যেই বাহির হইবে।

১৯২০ সাল ঠাকুরের ভুবনেশ্বর অবস্থান

এই বৎসর ঠাকুর বেশীর ভাগ সময় পুরী ও ভুবনেশ্বর ছিলেন। পুরীর আশ্রমের কার্য্য সমাধা করিতেছিলেন এবং ভুবনেশ্বরে অনেক জায়গা ক্রয় করিয়া সেখানেও গৌরিকুণ্ডের নিকটে একখানি আশ্রম তৈয়ারী করিতেছিলেন। গোঁসাইর জন্মোৎসবে মাত্র একবার কলিকাতা আসিয়া কিছুদিন মাত্র ছিলেন। উৎসবের পর আমি ও হিরণ ভুবনেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম এবং দুইদিন ছিলাম। ঠাকুর তখন মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীর বাড়ী ভাড়া করিয়া ছিলেন। তাহার পার্শ্বের জমীতে আশ্রম তৈয়ারী হইতেছিল। ঠাকুর আমাদিগকে অত্যন্ত যত্ন করিলেন এবং একসঙ্গে গৌরীকুণ্ডে স্নান, দেবালয় দর্শন ও ভ্রমণ ইত্যাদি করিতাম। এই বৎসর ঠাকুরের সঙ্গে আর বেশী সাক্ষাৎ হয় নাই।

১৯২১

ঠাকুরের বাসণ্ডা হিরণের বাটীতে গমন

ভুবনেশ্বর থাকিতে হিরণ ঠাকুরকে তাহার বাড়ীতে লইয়া যাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিল—তখন যাইতে রাজী হন নাই। ১৯২১ সালের প্রথম হইতেই হিরণ বিশেষ আগ্রহ করায় ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঠাকুর মহানন্দদা, অচ্যুৎদা, জিতুদা, চুনিদা, পরাণদা প্রভৃতি ৩০।৩৫টী আমাদের গুরুভাইকে সঙ্গে লইয়া হিরণের বাড়ীতে রওনা হইলেন—আমিও সঙ্গে গেলাম। হিরণের আনন্দের সীমা নাই। তিন দিন সেখানে ছিলেন। ঠাকুরকে দেখিতে দলে দলে স্ত্রীপুরুষ বহুদূর হইতে আসিতে লাগিল। হিরণের বাড়ীতে রোজ দুবেলা ২০০।২৫০ শত লোকের খাওয়া দাওয়ার আয়োজন খুব ধুমধামের সহিত হইল এবং সে অজস্র টাকা অকাতরে ব্যয় করিল। ঠাকুর বানরীপাড়া হইয়া গোপালগঞ্জে গিয়াছিলেন এবং সরস্বতী পূজার দিন সেখানে বহু নমঃশূদ্রের দীক্ষা হইয়াছিল।

পিতৃদেবের মৃত্যু। ঠাকুরের সান্ত্বনা

পিতৃদেবের শরীর অসুস্থ হওয়ায় ঠাকুরের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ভুবনেশ্বরে একটী বাড়ীভাড়া করিয়া তাঁহাকে পরিবারবর্গসহ ১৪ই ফেব্রুয়ারী পাঠাইয়া দিলাম। ঠাকুরও আমাকে বলিয়াছিলেন পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণ করিয়া তিনিও শীঘ্রই পুরী হইয়া ভুবনেশ্বর আসিবেন। ভুবনেশ্বর যাইয়াই পিতৃদেব ভয়ানক অসুস্থ হইয়া পড়িলেন।

২৮শে ফেব্রুয়ারী সংবাদ পাইলাম ঠাকুর পুরী যাইতেছেন—ভুবনেশ্বর ষ্টেশনে যাইয়া দেখা করিলাম। ঠাকুর পিতৃদেবের অসুখের সংবাদে খুব সহানুভূতি করিলেন। কিন্তু তাঁহার কথার ভাবে আমার মনে হইল পিতৃদেব এবার আর রক্ষা পাইবেন না। ষ্টেশনে ঠাকুর বলিলেন "চিকিৎসা করিয়া যাও, কিন্তু চিকিৎসা করিলেই বা কি হইবে ব্যারাম খারাপ।" ৩।৪ দিন পরে ঠাকুর ভুবনেশ্বর আসিলেন এবং একদিন আমার বাসায় আসিয়া রুগ্ন পিতাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ও আশ্বাস দিয়া গেলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছুই হইল না—পিতৃদেব ৯ই মার্চ্চ আমাদের মায়া ত্যাগ করিয়া ভুবনেশ্বরের মন্দিরের চূড়া দেখিতে দেখিতে সজ্ঞানে স্বর্গারোহণ করিলেন। বড়ই বিপদে পড়িলাম। ঠাকুর সৎকারের সকল ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং আমাদের কলিকাতা পাঠাইয়া দিলেন। কলিকাতায় পৌছিয়াই শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে ঠাকুর আমার স্ত্রীকে এই চিঠীখানা লিখিলেন।

"শ্রাদ্ধ কার্য্যটী কিরূপ হয় জানিতে ব্যাস্ত আছি। এই ঝঞ্ঝাট চুকিয়া গেলে বোধ হয় একটু নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে; আহারাদির নিয়ম যে ভাবে রক্ষা করিয়া চলিতেছ

শুনিয়া সুখী হইলাম। শরীরটী ভাল না হইলে সকলই পণ্ড! সাধন ভজন করিবে কিরূপে?

"ভুবনেশ্বর আসিয়াছিলে, শুধু তোমাদের দেখিবার জন্যই ভুবনেশ্বর গিয়াছিলাম। অনেককাল সাধন নিয়াছ। সঙ্গ কখনও তো হয় নাই। ভাবিয়াছিলাম ঠাকুর সুযোগ করিয়া দিলে, এবার তোমাদের সঙ্গে থাকিয়া অনেক কথা বলিব ও শুনিব—তাহা আর হ'ল না। অব্যবস্থা মত কোন কার্য্যই হয় না। বোধ হয় ভবিষ্যতে আরো সব বিষয়ে সুবিধামত সংযোগ করিবেন বলিয়া ঠাকুর ওরূপ করিলেন।

"ভিতরের অবস্থা, সাধনের কথা, সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই গোপনে রাখিতে হয়। না হইলে অনেক প্রকার বিঘ্ন ঘটে।

ঠাকুরের সহানুভূতিতে পিতৃদেবের জন্য শোকের অনেক উপশম হইল। ঠাকুরের কি দয়া!

চন্দননগরে মহাহোম দর্শন

এই বৎসর মহাষ্টমী পূজার দিন চন্দননগরে ঠাকুরের প্রবর্ত্তিত মহাহোম দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। ঠাকুর অনেক দিন হইতে ইহা করিয়া আসিতেছেন। ভারতবর্ষের কুত্রাপি এই জিনিস এখন আর নাই। ঠাকুরের সঙ্গে প্রায় ২০।২৫ জন ব্রাহ্মণ প্রকাণ্ড লম্বা অগ্নিকুণ্ডের চারিপাশে বসিয়া গেলেন। বেলা ৯টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত সকলে সমস্বরে, অতি মধুরস্বরে, চণ্ডিখানির প্রতি শ্লোক পড়িয়া এক একটী আহুতি "ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ অগ্নয়ে স্বাহা" বলিয়া দিতে লাগিলেন। এইরূপ ৭০০ শত শ্লোকের ৭০০ আহুতি। পুরাকালে মুনিঋষিদের আশ্রমে এইরূপ হোম হইত। ঠাকুর পুরাকালের এই লুপ্ত কীর্ত্তির পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। প্রায় ২।৩ হাজার লোকের সমাগম দেখিলাম। হোমান্তে প্রায় ১০০০ লোক প্রসাদ পাইল। এই মহাহোম প্রতি বৎসরই চন্দননগরে এখনও হইয়া থাকে।

পুত্র শোকে ঠাকুরের দয়া।

এই বৎসরের শেষে ডিসেম্বর মাসে আমার জীবনে এক ভয়ানক শোকাবহ ব্যাপার ঘটিল। ঠাকুরের কৃপায় এত অল্প সময়ের মধ্যে কিরূপ ভাবে সমুদয় ভোগগুলি কাটিয়া যাইতেছে! আমার প্রাণপুত্তলি, নয়নের মণি হৃদয়ের ধন, ১৪ বৎসর বয়স্ক জ্যেষ্ঠ পুত্র হেমেন্দ্র ফোর্থ ক্লাশে এ পড়িত এবং স্কুলের প্রথম ছাত্র ছিল। শুধু লেখা পড়ায় অনেকেই ভাল থাকে, কিন্তু তাহার গুণের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। জীবনে সে একটীও মিথ্যা কথা বলে নাই। এই বয়সেই তাহার ধর্ম্মে অনুরাগ, কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা, পিতা মাতার উপর ভক্তি, গীতা প্রভৃতি পুস্তক পাঠ দেখিয়া সকলেই তাহাকে ভাল বাসিত। আমি নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করিতাম। আমার সেই হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ মণিকে ২২শে ডিসেম্বর রাত্রি ১২টার সময় আমাদের বুক হইতে ছিন্ন করিয়া ঠাকুর কোথায় লইয়া গেলেন জানি না। আর তাহার মুখ জীবনে দেখিবার উপায় নাই। ৩২ দিন টাইফয়েডে এ ভুগিয়া সে জগতের সুখের অনিত্যতা দেখাইয়া, আমাদের হৃৎপিণ্ড উপাড়িয়া লইয়া অনন্তে মিশাইয়া গেল। শ্মশানে গগনভেদী চিৎকারেও তাহার কোন সাড়া শব্দ পাইলাম না। ১০ দিন শয্যাশায়ী হইলাম—কত কাঁদিলাম। বুক ফাটিয়া হৃদ্‌পিণ্ড বাহির হইয়া যাইতে চাইল—কিন্তু গেল না। ভাবিলাম কালনিশি যেন আর না পোহায়—আমার বুকের ধন যেখানে গিয়াছে আমিও সেই খানে চলিয়া যাই। কিন্তু আমার ইচ্ছায় তো কিছুই হয় না। দেখিলাম, রোজ সূর্য্য যেমন উঠিত তেমনিই উঠিতেছে। যাহার যে নিয়মিত কার্য্য, সকলেই যথাসময়ে তাহা করিতেছে। আমার দিকেতো কেহই তাকাইয়া দেখে না। আমার হৃদয় নিরানন্দ, ভাবিতাম সমস্ত জগতই বুঝি

নিরানন্দ। কিন্তু দেখিলাম পৃথিবীর কোন কার্য্যই আমার জন্য বন্ধ নাই। জগৎ পূর্ব্বেও যেমন আনন্দময় ছিল, এখনও ঠিক তেমনিই আছে—কেবল আমিই একা একা পড়িয়া আছি।

ঠাকুর তখন কাশীতে ছিলেন। খবর পাইয়া ১৯২২ সালের ১৪ই জানুয়ারী তারিখে ঠাকুর আমার স্ত্রীকে একখানা চিঠি লিখিলেন।

"মা, তোমার চিঠী খানা পড়িয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তোমার ঘরের মাণিক যে গৃহ অন্ধকার করিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহা আমি জানি। বহু ভাগ্যেই ঐ ছেলে তোমার গর্ভে জন্মিয়াছিল। সামান্য কর্ম্ম ছিল। শেষ হইতেই চলিয়া গেল। সকলেই নিজের প্রয়োজনে আসে, কর্ম্ম শেষ হ'লে কারো অপেক্ষা করে না—ইহাই নিয়ম। এখন উহার স্মরণেও তোমাদের কল্যাণ হইবে। চিত্ত পবিত্র ও কোমল হইবে। শোক চাপিয়া রাখিতে নাই—যখনই শোকের বেগ আসিবে প্রাণ খুলিয়া কান্দিও—উপকার হইবে। শোক অতি বিষম জিনিষ। ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠও পুত্রশোকে আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিলেন। এ সময়ে তত্ত্ব উপদেশে কোনও উপকার হবে না। কেহ যদি সহানুভূতি করিয়া সঙ্গে সঙ্গে কান্দিতে পারে—প্রাণ ঠাণ্ডা হয়—শোকের উপশম হয়। মহাভারত রামায়ণ এই সময় পাঠ করিতে হয়—ছেলেকে আহ্বান করিয়া শুনাইতে হয়। সময়ে সমস্তই ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে, ঠাকুরের নাম কর—শীতল হইতে ওরূপ ঔষধ আর নাই।

"তুমি শান্ত সুবোধ মেয়ে, এ সকল অনিবার্য্য বিধির বিধান নিজের পক্ষে ক্লেশকর বলিয়া অস্থির হইও না।

তুমিও দুদিন পরে কোথায় চলিয়া যাইবে তাহাই স্মরণ কর। মৃত্যুচিন্তা না আসিলে ধর্ম্মকর্ম্মে প্রকৃত আগ্রহ হয় না। ঠাকুরকে নিয়ত স্মরণ কর আর উপায় নাই। অন্যদিকে তাকাইবার আর অবসর নাই। সময় হ'য়ে এলো প্রস্তুত হও।

স্বপ্ন বিবরণ শুনিয়া আনন্দ হইল। এই সব স্বপ্ন স্বপ্ন নয় জীবনের অবস্থা। দেব দেবী ঋষি মুনি গুরু যে সকল স্বপ্নের ভিতরে থাকেন তাহা স্বপ্ন নয়—স্বপ্ন লিখিয়া রাখিও।

তোমরা আমার প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। শীঘ্রই কলিকাতা যাইব।

আং ব্রহ্মচারী—

১লা মাঘ ২১৬ নং সোনারপুর

বেনারস সিটী।

চিঠী খানি পড়িয়া প্রাণ শীতল হইল। কিন্তু এ আগুন যে কখনও নিভিতে পারে তাহা ভাবিতে পারিলাম না। ঠাকুরের কথা মত মহাভারত রামায়ণ পাঠ আরম্ভ করিয়া দিলাম। প্রথম শোক সংবরণ হইলে, হৃদয়ে কোথা হইতে যে একটা অস্বাভাবিক বল পাইলাম বলিতে পারি না। জীবনের আর একটা পৃষ্ঠা আরম্ভ হইল। জগতের অনিত্যতা এতদিন একটা কথার কথা মাত্র বোধ হইত, এখন একটু একটু করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলাম। ঠাকুর লিখিয়াছেন—"মৃত্যু চিন্তা না আসিলে ধর্ম্ম কর্ম্মে প্রকৃত আগ্রহ হয় না"—ঠাকুর তো ঠিকই লিখিয়াছেন—আর লিখিবেনই বা না কেন? তাঁহার তো পুঁথি গত বিদ্যা নয়। পূর্ণ অনুভূতির জ্ঞান। ভাবিলাম ঠাকুর আমার পিছনে পিছনে নিশ্চয়ই আছেন। আমাকে অগ্নী পরিক্ষা করিয়া লইবেন। ক্রমেই মনে হইতে লাগিল ঠাকুর কি দয়াল!

[illegible]

মজুমদার — কেমন আছেন?

[illegible]

[illegible] হয়। [illegible] হয় [illegible]।
[illegible] হইত [illegible]।
[illegible] হইল। এই [illegible]
[illegible] – [illegible]। [illegible]। [illegible]
[illegible] – [illegible]।[illegible]
[illegible]। [illegible]।
[illegible] – [illegible]
[illegible]। [illegible] হইত
[illegible]। [illegible] – [illegible] – [illegible]
[illegible]। [illegible] – [illegible]
[illegible] হয় [illegible]। [illegible] – [illegible]
[illegible]। [illegible]। [illegible]
[illegible] হয় [illegible] – [illegible] হয়।
[illegible]
[illegible] – [illegible] –
[illegible] –

জানুয়ারীর শেষে ঠাকুর কলিকাতা আসিলেন আমি দেখা করিতে গেলাম আমাকে দেখিয়াই ঠাকুর বলিলেন—"জিতেন তুমিতো বেশ আছ। পুত্র শোকের কষ্ট কমিয়া গিয়াছে?" তারপর সস্নেহে আমাকে কত রকমে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন বলিলেন "আত্মার বিনাশ নাই—ইহা ধ্রুব সত্য কেবল একটা পরদার আড়ালে থাকে এই মাত্র। যে যাহার নিজের প্রয়োজনে আসে—প্রয়োজন শেষ হইলেই চলিয়া যায়—আর কিছু মনে থাকে না। অভিমন্যুর শোকে অর্জ্জুন যখন বড়ই শোক করিতে ছিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ অভিমন্যুকে অর্জ্জুনের কাছে আনিয়া দিলেন—অভিমন্যু আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অভিবাদন করিলেন—অর্জ্জুনের দিকে একবার তাকাইলেনও না। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন 'অভিমন্যু তোমার পিতা দণ্ডায়মান তাহাকে কিছু বলিলে না? অভিমন্যু বলিল 'কৈ আমিতো চিনিতেছি না, আমার কোন্ জন্মের পিতা আপনি বলিয়া দিন্'। এই তো মানুষের অবস্থা—যাহাকে লোকে নিতান্ত আপনার বলিয়া মনে করে, যাহার মায়ায় অন্ধ হইয়া আসল কর্ম্ম ভুলিয়া যায়, সেও কিছু নয়।"

একটু থামিয়া আবার বলিলেন "তোমার পুত্র এই ঘরের মধ্যেই আছে, দেখিতে চাও? তোমায় দেখাইতে পারি, কিন্তু তাহাতে তোমার কোনও উপকার হইবে না - তোমার ভয় করিবে। নিয়ম মত সাধন ভজন করিয়া যাও, সময়ে সব ঠিক হইয়া যাইবে একমাত্র নামই সম্বল আর সব মিথ্যা।"

১৯২২ সালে পুরীতে

গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব উৎসব

এপ্রিল মাসে স্থির করিলাম পুরীর উৎসবে পরিবারবর্গ পুরীতে ঠাকুরের কাছে পাঠাইয়া দিব। ঠাকুর অনুমোদন করিলেন। ৫ই মে সকলে পুরী চলিয়া গেল। ঠাকুর খুব যত্ন করিলেন এবং আমার যাহাতে কোনও অসুবিধা না হয় তাহার সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং কয়েক দিন খুব আনন্দে কাটাইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

আমার কঠিন পীড়াতে ঠাকুরের আশ্বাস

পুরী হইতে ফিরিয়া আসিবার পরদিন হইতে কঠিন রক্ত আমাশায় রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইলাম। রোগ ভীষণ আকার ধারণ করিল। ক্রমাগত ২৬ দিন রক্তপাত হইল। ডাক্তারেরা জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিল। এই সময় আমার স্বগ্রামবাসী বাল্য বন্ধু ডাক্তার হরিশ সেন সস্ত্রীক পুরী হইতে দীক্ষা লইয়া আসিল এবং অক্লান্ত ভাবে আমার চিকিৎসায় যোগদান করিল। ঠাকুরের কৃপায় জীবন রক্ষা হইল বটে কিন্তু কিছুদিনের মত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলাম। ২।৭।২২ তারিখে ঠাকুর আমাকে লিখিলেন—

স্নেহের জিতেন,—

ঠাকুরের কৃপায় জীবন-সঙ্কট রোগ হইতে এবার রক্ষা পাইয়াছ। আমি সর্ব্বদাই তোমার খবর নিয়াছি। তোমার আরোগ্য সংবাদে বড়ই আরাম পাইলাম। বহুকাল ব্যবসা বন্ধ থাকায় যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে—তজ্জন্য মনে কিছু চিন্তা করিও না। দাতা ভগবান, কখন কি সূত্রে কি করিবেন বলা যায় না। শরীরটা বেশ সুস্থ রাখিয়া কার্য্য করিয়া যাও। এত কাল ব্যবসা বন্ধ বলিয়া ব্যস্ত হইও না। যাহা প্রয়োজন ঠাকুর দয়া করিয়া তাহার অভাব রাখিবেন না, কিন্তু তাই বলিয়া আরামের জন্য প্রয়োজন সৃষ্টি করিও না।”

ঠাকুরের কাশী গমন

শরীর নিতান্ত কাতর হওয়ায় হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য সপরিবারে পূজার পূর্ব্বে মধুপুর গেলাম। এবার গোঁসাইএর জন্মোৎসবে ঠাকুর কলিকাতা আসেন নাই। পুরীতেই উৎসব করিলেন। পূজার পূর্ব্বে চন্দননগরে আসিয়া মহাহোম সমাধা করিয়া কাশী যাইবেন শুনিলাম। ২৩শে অক্টোবর তারিখ কাশী রওনা হইলেন। আমরা মধুপুর ষ্টেশনে গিয়া দেখা করিয়া আসিলাম। হরিশ ডাক্তার ও তাহার স্ত্রীও সঙ্গে গিয়াছিল। প্রায় ২মাস কাশীতে থাকিয়া বড়দিনের ছুটীর পূর্ব্বে কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন এবং সত্যরঞ্জন বাবু ডাক্তারের বাড়ীতে উঠিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময়ও মধুপুর ষ্টেশনে দেখা করিতে গিয়াছিলাম।

১৯২৩

ভন ডি গ্র্যাফ্ট সাহেব ও তাঁহার স্ত্রীর দীক্ষা।

ঠাকুর সত্যরঞ্জন বাবু ডাক্তারের বাড়ীতে আছেন। আমরা জানুয়ারী মাসের প্রথমেই মধুপুর হইতে চলিয়া আসিয়াছি। শরীর এখন অনেক সুস্থ হইয়াছে। ৯ই জানুয়ারী দেওঘর হইতে আমাদের আত্মীয় ডাক্তার শচীনবাবু অ্যানথ্র্যাক্স রোগে আক্রান্ত হইয়া আমাদের বাড়ীতে সপরিবারে আসিলেন। তাঁহাকে মেডিক্যাল কলেজে লইয়া অপারেশন করান হইল এবং তাঁহার স্ত্রী সুধাদিদিকে ও তাঁহার সঙ্গে এজরা ওয়ার্ডে রাখিবার বন্দোবস্ত করা হইল। রোজ একবার বিকালে সেখানে গিয়া দেখিয়া আসিতে হইতেছে ওখান হইতে মিরজাপুর ষ্ট্রীটে গিয়া ঠাকুরকে রোজ একবার দর্শন করিয়া আসি। শচীনবাবু সুস্থ হইলে সপরিবারে তাহাদেরও দীক্ষা হইয়াছিল।

২৭শে জানুয়ারী সন্ধ্যার সময় একজন গুরুভ্রাতা আসিয়া ঠাকুরকে খবর দিলেন যে মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে একটী সাহেব ও মেমসাহেব গুরুভ্রাতা যতীনদাদার দোকানে ঠাকুরের ছবি দেখিয়া ঠাকুরকে দেখিবার জন্য প্রায়ই খবর লন। যতীনদাদা বলিয়া পাঠাইয়াছেন তাঁহারা কল্যই ২টার সময় দেখা করিতে আসিবে। সাহেব ও মেমসাহেব কি জন্য ঠাকুরকে দেখিতে চান, এবং তাঁহাদের বাড়ী কোথায় এবং কি কার্য্য করেন কেহই সেই বিষয়ে কিছুই বলিতে পারিল না। তথন ঠাকুর বলিলেন **"সাহেব ও মেম কি প্রয়োজনে আসিতে চায় তাহা পূর্ব্বে একটু জানা দরকার,**

কারণ অনেক সময় উহারা সাধু দেখিলে হাতের করকোষ্ঠী গণাইতে চায়, কিংবা অন্য কোনও প্রকার অলৌকিকত্ব দেখিতে ইচ্ছা করে, কিংবা রোগ আরোগ্যের জন্য আসিয়া থাকে। উহাদের মনের গতি কোন দিকে এবং উহারা কি করে, এবং কোন দেশীয় তাহা জানা দরকার" তোমরা কেহ মিউনিসিপাল মার্কেটে যাইয়া যতীনকে আমার নিকট অদ্যই রাত্রে পাঠাইয়া দিও তাহার নিকট সবিশেষ শুনিতে হইবে "

আমি ও হরিশ দাদা তখন বলিলাম যে আমরা ভবানীপুর যাইবার পথে উহাদিগকে বলিয়া যাইব, এবং আমি বলিলাম ঠাকুরের অনুমতি হইলে আমি কল্য ২টার সময় সাহেবদের সঙ্গেও আসিতে পারি। ঠাকুর বলিলেন "আচ্ছা বেশ, তোমার অসুবিধা না হইলে সঙ্গে আসিও" ঠাকুর যোগেশদাদাকে ঐসময় আসিবার জন্য খবর পাঠাইলেন।

তখন আমরা মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে যাইয়া যতীনদাদা ও নবদ্বীপ দাদাকে খবর দিলাম। কিন্তু সাহেবদের বিশেষ কোন পরিচয় তাহারাও বলিতে পারিল না। কেবল মাত্র বলিল যে মেম সাহেব রোজই ঠাকুরকে দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। অদ্যও দুইবার আসিয়াছিল। জাভা ফায়ার ইন্‌সিওরেন্সকোম্পানীর ম্যানেজার—৭টা কোম্পানী তাহার অধীনে—বড়লোক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কি জন্য ঠাকুরকে দেখিতে চায় তাহা কিছুই অনুমান করিতে পারিলাম না। তবে বোধ হয় ধর্ম্ম কথাই শুনিতে চায়।

২০শে জানুয়ারী—

অদ্য বেলা ১।৪৫ মিনিটের সময় মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে যতীন দাদার দোকানে যাইয়া দেখি তিনি, একটু পূর্ব্বেই সাহেব ও মেমকে ঠাকুরের নিকট লইয়া যাইবার জন্য গ্র্যাণ্ড হোটেলে চলিয়া গিয়াছেন এবং আমাকেও

সেখানে যাইতে বলিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বরাত্রে বন্দোবস্ত ছিল ১।৩০ মিনিটের সময় যতীনদাদার দোকানে যাইব, সেখান হইতে আমরা একসঙ্গে সাহেবের ঘরে যাইয়া তাহাকে লইয়া যাইব কিন্তু আমার ১৫ মিনিট দেরী হওয়ায়, যতীনদাদা পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছেন। আমি তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গ্র্যাণ্ড হোটেলের দিকে যাইতে লাগিলাম, এবং সদর দরজার নিকট ৫ মিনিট কাল দাঁড়াইবার পরই দেখি, একটী সাহেব ও মেম যতীনদাদার সহিত চৌরঙ্গী রোডের উপর একখানি মোটর গাড়ীর নিকট আসিলেন, তখন ঠিক ২টা বাজিয়াছে। আমি অগ্রসর হইয়া সাহেবকে অভিবাদন করিয়া বলিলাম যে, আমিও তাহাদের সঙ্গে যাইব। সাহেব তৎক্ষণাৎ অতি সমাদরে আমাকে গাড়ীতে উঠিতে আহ্বান করিলেন। আমি ড্রাইভারের পাশে বসিলাম উহারা ভিতরে বসিলেন।

গাড়ী ছাড়িয়া দিলে আমি প্রথমে বলিলাম "আপনি যে সাধুকে দেখিতে যাইতেছেন তিনি আমার গুরু"। শুনিয়া তাহারা উভয়ে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তাহার পর নানাপ্রকার কথাবার্ত্তায় জানিতে পারিলাম সাহেব জাতীতে ড্যাচ্ এবং জাভার বেটেভিয়া নগরে বাসস্থান। জাভা ফায়ার্ ইনসিওরেন্স কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার। কলিকাতায় প্রায় একবৎসর যাবৎ আছে। বোম্বে, রেঙ্গুন ইত্যাদি স্থানেও মাঝে মাঝে কার্য্যোপলক্ষে থাকিতে হয়।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কি কোন ধর্ম্মের কথা শুনিবার জন্য সাধু দর্শন করিতে যাইতেছেন, না কেবল কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া যাইতেছেন।" সাহেব বলিল "না, আমি অনেকদিন পর্য্যন্ত যোগের বিষয় জানিবার জন্য যোগীর অনুসন্ধান করিতেছি। একজন যোগীর নিকট ইতিপূর্ব্বে গিয়াছিলাম তিনি হঠযোগ না কি বিষয়ে আমাকে অনেক কথা বলিয়াছিলেন আমি তাহা ভাল বুঝিতে পারি নাই।" তখন আমি ঠাকুরের জীবনী সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটু বলিলাম। সাহেব ও মেম

উভয়েই খুব আগ্রহ সহকারে তাহা শুনিতে লাগিল। এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে আমরা ২।১৫ মিনিটের সময় মিরজাপুর ষ্ট্রীটে সত্যরঞ্জনবাবু ডাক্তারের বাটীতে পৌছিলাম। সাহেব মেমকে নীচের ঘরে ২।৪ মিনিট বসাইয়া রাখিয়া আমি ঠাকুরের নিকট তাড়াতাড়ি গিয়া বলিলাম যে উহারা ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা করিতে আসিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। ঠাকুর উহাদিগকে অবিলম্বে উপরে লইয়া আসিতে বলিলেন। আমরা সকলে তাহাদিগকে উপরে লইয়া আসিলাম। ঠাকুর স্থিরভাবে তাঁহার আসনে উপবিষ্ট। ঠাকুরের সাম্নে দুইখানা চেয়ার উহাদিগের বসিবার জন্য দেওয়া হইয়াছিল। উহারা তাহাতে বসিল। ঠাকুর তাহাদিগকে জুতা সহিতই আসিতে বলিলেন। উহারা ঘরে ঢুকিবামাত্র ঠাকুর সহাস্যে তাহাদিগকে অভিবাদন করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন আমি, যোগেশদাদা ও সত্যরঞ্জন বাবু ঠাকুরের তিন দিকে দোভাষীরূপে বসিলাম।

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনারা কি বিষয় জানিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন।"

সা। আমরা ধর্ম্মসম্বন্ধে কতকগুলি বিষয় জানিবার জন্য আসিয়াছি। বিশেষতঃ আমার মেমসাহেবের কয়েকটী প্রয়োজনীয় বিষয় জানিবার আছে। উহার জীবনে কিছুদিন যাবৎ কতকগুলি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিতেছে, আমরা তাহার কোনও কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিতেছি না।

ঠা। কি কি ঘটনা ঘটিতেছে আমাকে বলুন।

সা। মেমসাহেব যখন বালিকা ছিলেন তখন প্রায় অনেক সময় সুন্দর সুন্দর গান ও বাজনা শুনিতে পাইতেন। তাহার মনে হইত যেন দূর হইতে সঙ্গীতের স্বর উঠিত। কিন্তু ঠিক কোন দিক হইতে কিভাবে সেই স্বর আসিত, তাহা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। বালিকা অবস্থায় এইরূপ কিছুদিন হইয়া উহা অনেকদিন হইল বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু প্রায় ছয়মাস পূর্ব্বে একদিন হঠাৎ মেম সাহেব তাহার সম্মুখে কতকগুলি আলোর মত দেখিতে পাইলেন।"

ইহা বলিতে বলিতে সাহেব চেয়ার হইতে নামিয়া মেজেতে বসিয়া পড়িলেন।

ঠা। কি প্রকার আলো দেখিয়াছিলেন।

সা। ক্যাণ্ডল লাইটের মত আলো দেখিয়াছেন।

ঠা। তিনি যে আলো দেখিয়াছেন বলিতেছেন, তাহার পরিমাণ কি রকম, অর্থাৎ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে কত বড়, এবং ঐরূপ কয়টী আলো দেখিয়াছেন। আলো শরীরের কোন স্থান হইতে অনুভব হইত এবং কতদূরে অবস্থিত ছিল বলিয়া বোধ হইত।

উপরোক্ত কথোপকথন হইতেছে কিন্তু এতক্ষণ মেমসাহেব একটী কথাও বলেন নাই। ধীর স্থিরভাবে চেয়ারে বসিয়া যেন বিহ্বল নয়নে চারিদিকে তাকাইতেছেন—একবার সাহেবের দিকে—একবার ঠাকুরের দিকে তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ, কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যেন তাহার অনেক কথা বলিবার আছে—চক্ষু দুটী যেন নিতান্ত জিজ্ঞাসুভাবে একদৃষ্টে ঠাকুরের দিকে নিবদ্ধ রহিয়াছে। দেখিলেই যেন সরলতার একখানি সুন্দর নিখুঁত ছবি বলিয়া মনে হয়। মুখে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্যের ভাব লক্ষিত হয় নাই, কিন্তু মনে হইল তাহার সমস্ত অন্তরটী যেন একটা গভীর বিষয় জানিবার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে। ঠাকুরের প্রশ্ন যেন তাহার অন্তঃস্থলে গিয়া প্রবেশ করিল। সে যাহা দেখিয়াছে তাহা নিজমুখে ব্যক্ত করিবার জন্য নিজেই উত্তর দিতে লাগিল।

মে। আমি একদিন আমার ঘরের ভিতর বসিয়া আছি, এমন সময় আমার মনে হইল, যেন হঠাৎ আমার চক্ষের সম্মুখে, ঠিক ললাটদেশে,

তিন চার হাত তফাতে একসঙ্গে খুব বড় বড় প্রায় ১ ফুট উচ্চ এবং মোটা মোটা ১৯টী ক্যাণ্ডল্ লাইট, অর্দ্ধচন্দ্রাকার (semicircular) ভাবে সাজান রহিয়াছে। দেখিয়াই আমি চমকিয়া উঠি—তখন যেন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে, আর কোথায়ও কিছু নাই, কেবল সেই উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে। আমি একেবারে বিহ্বল হইয়া দেখিতে লাগিলাম এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে আকাশবাণীর মত আমার কর্ণে প্রবেশ করিল যেন কেহ বলিতেছে "watch and look" (দেখ)—এমন উজ্জ্বল আলো আমি আর কখনও দেখি নাই। সেই আলোকময় মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দেখিয়া আমি একেবারে আশ্চর্য্য হইলাম। আমি ইহার কারণ জানিতে চাই—

মেমসাহেব এই কথাগুলি এমনভাবে বলিলেন যেন সেই ঘটনা স্মরণ করিয়া তাহার মন উত্তেজিত হইয়াছে।

ঠাকুর তাহার ঐ অবস্থা দেখিয়া অতি ধীরভাবে প্রশ্ন করিলেন, **"আপনি যে ক্যাণ্ডল্ লাইটগুলি দেখিয়াছেন তাহার বর্ণ কি রকম বলিয়া মনে হইল এবং তাহার শিখা কি প্রকার।**

মে। আলোগুলির বর্ণ হরিদ্রাভ এবং শিখা ঠিক মোমবাতীরই ন্যায় দেখিয়াছি। এইরূপ আলোর দর্শনের পর হইতে আমি স্থির হইয়া একটু বসিলে, প্রায়ই আমার এইরূপ অনুভূতি হয়, যেন আমার Astral body (সূক্ষ্মদেহ) আমার দেহ হইতে বাহির হইয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। আমি ইহার কিছুই কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি না।

ঠা। **এই যে Astral body দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়, উহার আকৃতি কিরূপ দেখিতে পান বলিয়া মনে হয়, এবং তখন আপনার নিজদেহ সজীব বলিয়া মনে হয়, না একেবারে মৃতের ন্যায় বোধ করেন।**

মেমসাহেব তখন ভীতিবিহ্বল ভাবে উত্তেজিত স্বরে উত্তর করিলেন

"আমার মনে হয় যেন একটী পরিষ্কার সাদা ধপধপে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি আমার দেহ হইতে বাহির হইয়া আমার চক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। এবং সেই মূর্ত্তিটী যেন অবিকল আমার নিজেরই প্রতিমূর্ত্তি। আমার দেহ তখন একেবারে অসাড় ও মৃতবৎ বলিয়া মনে হয়। এবং আমার পায়ের নীচে সমস্ত পৃথিবী যেন থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে—আমি স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারি না—সমস্ত যেন একটা স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। মনে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয় এবং মনের অবস্থা যে কিরূপ হয় তাহা আমি ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি না। এইরূপ কিছুক্ষণ আবার কি প্রকারে Astral body আমার ভিতরে আসিলে আমার জ্ঞান হয়, কিন্তু কি প্রকারে উহা ভিতরে আসে আমি কিছুই বুঝিতে পারি না।

ঠা। কোন Processএ ঐরূপ Astral body দেহ হইতে বাহির হইয়া যায় তাহা কিছু অনুভব করিতে পারেন।

মে। না আমি তাহা বলিতে পারি না।

ঠা। আপনার এইসকল দর্শন ও অনুভূতি হয়, ইহা খুব উত্তম অবস্থা আপনি এখন এইসকল বিষয়ে কি জানিতে চাহেন।

সা। এইসকল দর্শন কেন হয় জানিবার জন্য আমরা বড়ই উৎসুক হইয়াছি। আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, আমরা আমাদের জীবন এমনভাবে গঠিত করিতে পারি এবং এইরূপ শক্তি অর্জ্জন করিতে পারি যাহাতে আমরা রোগীর রোগ মুক্ত করিতে পারি এবং পরের উপকার করিতে পারি—মোটের উপর নিজেরা ভাল হইতে পারি এবং পরকে ভাল করিতে পারি।

আমরা ঠাকুরকে সাহেবের কথা বুঝাইতেছি এমন সময় মেমসাহেব একটু জোরের সহিত বলিয়া উঠিল।

"আমার এইরূপ আলো দর্শন কেন হইয়াছে, আমি উহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারি না—আমি তাহা জানিতে চাই এবং আমার শরীর হইতে যে পদার্থ বাহির হইয়া যাইয়া, আমার দেহকে কেন এমন মৃতবৎ করিয়া ফেলে, আমি তাহার কারণ জানিবার জন্য বড়ই উদ্‌গ্রীব হইয়াছি। ইহা ছাড়া আমি নিজে খুব সৎ হইতে চাই এবং এমন ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে চাই যে, আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আমার সমুদয় ভ্রাতাভগ্নীদেরও সৎপথে চালাইতে পারি—যেন আমি আমার দেশে গিয়া বলিতে পারি যে আমি কি শক্তি অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছি।"

ঠা। আপনারা যে অর্থে পরোপকার করা হয় ভাবিয়া লইতেছেন, উহা অনেক সময় পরের যথার্থ উপকার না হইয়া ক্ষতিজনকও হইতে পারে। কি করিলে ঠিক পরের উপকার হয়, বা অপকার হয়, তাহা বুঝা কঠিন। এমন কার্য্য আছে যাহাতে একদিকে উপকার হইতে পারে, আবার আর একদিকে বিশেষ ক্ষতি হয়—যেমন কোনও স্থানে কতকগুলি ক্ষুধিত নরনারীকে দেখিয়া, যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া, একদিনের জন্য সুখাদ্য ভোজ দিয়া, হয়তো ভাবিতে পারেন যে ক্ষুধিতকে অন্নদান করিয়া বড়ই উপকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার ফলে উদরাময় হইয়া বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া এবং পরিশেষে একটা মহামারীর সৃষ্টি হইয়া অনেক ক্ষতি হইতে পারে। তেমনি রোগীকে রোগমুক্ত করিতে পারিলেই সকল সময় উপকার করা হয় না। মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যই আত্মার চরম উৎকর্ষ সাধন করা। আত্মজ্ঞান লাভ না করিতে পারিলে কোন কার্য্যই সফল হয় না। আমরা সকলেই এই পৃথিবীতে

আত্মার উন্নতি সাধন করিতে আসিয়াছি। আত্মার প্রকৃত সন্ধান না পাইলে, কিছুতেই শান্তিলাভ করা সম্ভব নহে। পরের কথা দূরে থাকুক, এমন কি নিজের স্ত্রী, পুত্র, ভাই, বন্ধু ইত্যাদি সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিয়া, এই পরমাত্মার সন্ধান লইতে হইবে এবং তাহাতে সিদ্ধকাম হইতে পারিলে জগতের উন্নতি আপনা আপনিই সাধিত হইতে থাকিবে। আমি আপনাদের মনের ঠিক আসল উদ্দেশ্য কি তাহাই জানিতে চাই। আপনার যেসকল দর্শনাদি হয়, আপনি কোনওরূপ শক্তি অর্জ্জন করিয়া তাহাই বাড়াইতে চাহেন, না শক্তি দ্বারা রোগীর রোগ মুক্ত করিবার ক্ষমতা চাহেন, না আত্মার সন্ধান করিয়া পরম শান্তি লাভ করিতে চাহেন, তাহাই আমাকে পরিষ্কার করিয়া বলুন।

মেমসাহেব একটু যেন চকিত ও কাতরভাবে বলিয়া উঠিলেন "আমি পুত্রকন্যা কি প্রকারে ত্যাগ করিব—আমার যে পুত্রকন্যা আছে"।

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন "না, না আমি তাহা বলিতেছি না। আপনি পুত্রকন্যা কেন ত্যাগ করিবেন, আপনাকে সাংসারিক সম্বন্ধ কিছুই ত্যাগ করিতে হইবে না। এই সংসারের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে লিপ্ত থাকিয়াও আত্মার উন্নতি সাধন করিয়া পরম শান্তিলাভ করা যায়, আপনি তাহাই করিবেন। আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে পরের যথার্থ উপকার আপনা আপনিই হইতে থাকিবে এবং জগতের বিশেষ উপকার সাধন হইবে। নিজে শক্তিশালী না হইলে পরের উপকার ঠিকভাবে সম্পন্ন করা যায় না—আপনি কি চাহেন?

মেমসাহেব একটু গম্ভীরভাবে চিন্তা করিয়া আস্তে আস্তে যেন একটু আশ্চর্য্য হইয়া অতি কোমলভাবে বলিলেন "আমি পরম শান্তিলাভ করিতে চাই। আমি সর্ব্বপ্রকারে সৎ হইতে চাই।"

ঠা। আপনার যে আলো দর্শন হয়, উহা কি বেশ আপনা আপনি স্বাভাবিকভাবে হয়, না এই সম্বন্ধে আপনার কোন পূর্ব্বসংস্কার ছিল।

মে। আমি কথনও কোন দর্শনশাস্ত্র পাঠ করি নাই এবং উহা যেন বেশ স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।

ঠা। আপনার যে সকল দর্শন ও অনুভূতি হয়, আমি ইহার জন্য আপনাকে বিশেষ ভাগ্যবতী বলিয়া মনে করি। ইহা বাস্তবিকই খুব উত্তম জিনিষ। কিন্তু আপনি মনে রাখিবেন যে, এইরূপ দর্শনাদি হওয়ার শক্তি অর্জ্জন করাই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য নহে। আত্মার সন্ধান লাভ করিয়া, আত্মার সঙ্গে মিলিত হইয়া, পরম শান্তি ও অতুলনীয় আনন্দ লাভ করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই আমরা সকলে জীবনপথে যাত্রা করিয়া অগ্রসর হইতেছি। উহাই মানবের চরম লক্ষ্য এবং ঐ অবস্থা লাভ করিতে পারিলেই আমরা গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইতে পারি। আপনার দর্শনাদি সমুদয় পথের দৃশ্যের ন্যায় মনে করিবেন। উহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া কালক্ষেপ করিবেন না। গন্তব্যপথে যাইবার সময় পথে যাইতে যাইতে, ডাহিনে, বামে, সম্মুখে, অনেক রকম দৃশ্য চক্ষে পড়িবেই, কিন্তু তাহার প্রত্যেকটীর অনুসন্ধান করিয়া যাইতে হইলে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে নিশ্চয়ই বিলম্ব হইয়া যায়—কিন্তু

উহা কেবল দৃশ্যের ন্যায় দেখিয়া গেলে আর সময় বৃথা ক্ষেপ করা হয় না। যেমন এইস্থান হইতে দিল্লী যাওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য লইয়া যাইতে হইলে ডাহিনে, বামে, কত পাহাড় পর্ব্বত, নদনদী, কত রকম দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, উহার প্রত্যেকটীর ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া যাইতে গেলে মূলদেশে পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব হইয়া যায়, কিন্তু ঐসকল দিকে কেবল পথের দৃশ্যের ন্যায় দৃষ্টি দিয়া একটানা গন্তব্য পথের দিকে অগ্রসর হইলে শীঘ্রই যাওয়া যায়। আপনার দর্শন ইত্যাদিও পথের দৃশ্যের ন্যায় মনে করিবেন, উহার কারণ জানিবার জন্য ব্যস্ত হইলে পরম শান্তিময় স্থানে যাইয়া শান্তিলাভ করিতে দেরী হইবে। আপনি পরিষ্কাররূপে চিন্তা করিয়া দেখুন আপনি পরম শান্তিলাভ করিতে চাহেন কি না।

মে। আমি শান্তি চাই, ভগবানের দর্শন চাই, আত্মার সন্ধান চাই।

ঠা। আপনি আলো দর্শনের সময় যে আকাশবাণী শুনিয়াছিলেন সেই অনুসারে কোনও প্রক্রিয়া করিয়া থাকেন ?

মে। বিশেষ কোন প্রক্রিয়া করি না, তবে সময় সময় যেন ধ্যানের ভাব আসে কতকটা tranceএর মত হয় এবং ঐরূপ astral body (সূক্ষ্মদেহ) শরীর হইতে বাহির হইয়া সম্মুখে আসিয়া পড়ে এবং "সুষুম্নার" ভিতর যেন কিরূপ sensation (অনুভূতি) হয়।

ঠা। সুষুম্না অর্থে আপনি কি বুঝিয়াছেন ?

মে। সুষুম্না অর্থে আমি মেরুদণ্ড (spinal cord) বুঝিয়াছি।

ঠা। আচ্ছা, আপনি আকাশবাণী অনুযায়ী যাহা করিতে-

ছেন, এবং যে অবস্থায় আছেন, তাহাই আর কিছুদিন করিতে থাকুন, তাহাতে মনে শান্তি না পাইলে আমাকে জানাইবেন।

মে। আমি ঐরূপ কার্য্য দ্বারা মনে শান্তি পাইতেছি না, আমি পরম শান্তি চাই, ভগবানের দর্শন চাই।

ঠা। আমি আবার বলিতেছি আপনার যে সকল দর্শন হয় তজ্জন্য আপনি বড়ই ভাগ্যবতী। এই সকল সাধন অঙ্গের বড়ই অনুকূল অবস্থা। আপনি উহার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন না। কিন্তু আত্মার সন্ধান পাইয়া শান্তি লাভ করিতে হইলে, একটী বিশেষ প্রণালী অবলম্বন আবশ্যক, আপনি কি তাহা করিতে চাহেন?

মে। হ্যাঁ, আমি এই বিষয় প্রণালী ধরিয়া শিক্ষা পাইতে চাই এবং ইহার জন্য মাষ্টার চাই।

ঠা। আপনি ভাল করিয়া ভাবিয়া এবং বুঝিয়া দেখুন। এই সাধন-প্রণালী বহু পুরাতন এবং মুনি ঋষিদের প্রবর্ত্তিত, ইহা অতি গোপনীয় জিনিষ, ইহা অবলম্বন করিলে অতি গোপনে রাখিতে হইবে।

মে। নিশ্চয়ই, খুব গোপনে রাখিব তাহাতে সম্পূর্ণ স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি।

সা। আমারও একটী কথা—আমরা যে এখানে আসিয়াছি ইহাও যেন খুব গোপনে থাকে।

তখন ঠাকুর সকলকে বলিয়া দিলেন যে এই কথা যেন কেহ প্রকাশ না করে।

ঠা। আপনার অবস্থা অনেক বিষয়ে এই সাধন-প্রণালীর

অনুকূল কিন্তু বাধা বিঘ্নও যথেষ্ট আছে। আপনাকে মাংস ও মাদক দ্রব্য একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে।

মে। আমি মাছ মাংস মদ ইত্যাদি একেবারেই খাই না, আমি নিরামিষ আহারী এবং একবার মাত্র আহার করি। আমার বেশী আহারের প্রয়োজন হয় না।

ঠা। আপনি ও সাহেব উভয়েই কি এই সাধন প্রণালী অবলম্বন করিতে চাহেন!

সা। হ্যাঁ, আমরা উভয়েই চাই।

ঠা। আমি শুধু নিজের ইচ্ছায়ই কাহাকেও এই সাধন-প্রণালী দিতে পারি না। আপনাদের সম্বন্ধে আমার নিজের মনে মনে অনেক অনুসন্ধান করিতে হইবে এবং অনেক বিষয় জানিয়া দেখিতে হইবে যে আপনাদের এই সাধন প্রাপ্তি হইবে কি না। যদি আপনাদের ভাগ্যে থাকে, তাহা হইলে আগামী বুধবার আপনাদিগকে জানাইব।

মে। আপনি অবশ্য আমাদিগকে test (পরীক্ষা) করিয়া লইবেন।

ঠা। না আমি ইহা দ্বারা পরীক্ষা করার কথা বলিতেছিনা। আপনাদের সম্বন্ধে আমার অনেক চিন্তা করিয়া অনেক বিষয় জানিতে হইবে, সেই জন্য কিছু সময় আবশ্যক। বুধবার দিন আপনাদিগকে সময় ও তারিখ নির্দ্দেশ করিয়া দিব, তখন আপনাদের অসুবিধা হইলেও, তাহা অতিক্রম করিয়া আসিতে হইবে।

সা। আমরা অবশ্য আসিব।

মেম সাহেব খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"আমি নিশ্চয়ই

এই সাধন প্রণালী পাইব। কারণ গতকল্য রাত্রে আমি tranceএর সময় পরিষ্কার দেখিতে পাইলাম যেন একজন খুব লম্বা যোগী মহাপুরুষ আমার অতি নিকটে আসিয়া আমাকে বলিতেছেন—wait and see (অপেক্ষা কর এবং দেখ) ঐ কথা আমি পরিষ্কার শুনিতে পাইলাম। তিনি আরও বলিলেন যে তিনি একটা বিশেষ মণ্ডলীর লোক এবং আমাকেও সেই স্থানে যাইতে হইবে। আমি নিশ্চয় এই সাধন পাইব"।

তাহার পর সাহেব ও মেম ঠাকুরের সহিত করমর্দ্দন করিয়া রাত্রি ১০॥০টার সময় বিদায় হইলেন এবং আমাকে আমার বাড়ী পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিলেন।

৩০শে জানুয়ারী—

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছি। অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর ঠাকুর আমাকে একটু আড়ালে নিয়া গোপনে বলিলেন "তুমি কল্য অতি প্রত্যূষে সাহেবকে বলিয়া আসিবে যে, আমাদের দিক হইতে তাহাদিগকে সাধন দেওয়া যাইতে পারে ; কিন্তু তাহাদের আরও ২।৩ দিন বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক—তাহাদের দিক হইতে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হইলে, আমাকে জানাইবে তখন আমি বলিব। ফল কথা তাহারা বিশেষ বিবেচনা করিয়া, সকল দিক দেখিয়া, একেবারে মনস্থির করিতে পারিলে, আমাদের দিকে কোন আপত্তি হইবে না"—বিশেষ সাবধানতার সহিত এই কথাগুলি সাহেবকে বুঝাইয়া দিতে বলিলেন এবং তাঁহারা কি বলেন তাহা কল্য সংবাদ দিতে বলিলেন। বাসায় চলিয়া আসিলাম।

৩১শে জানুয়ারী—

গ্র্যাণ্ডহোটেলে পূর্ব্বে একবার মাত্র গিয়াছিলাম—তখন কাছারীর পোষাকে গিয়াছিলাম। ভাবিলাম কোট-প্যাণ্ট পরিয়া না গেলে সুবিধা হইবে না—বিশেষ প্রথম দিন রুম খুঁজিয়া বাহির করিতে দেরী হইবে বলিয়া

কোটপ্যান্ট পরিয়া ঠিক ৭॥০টার সময় গ্র্যাণ্ড হোটেলে খানিকক্ষণ খুঁজিয়া সাহেবের রুম নং ৩২১ পাইলাম। দেখিলাম ৩২১।২৩ তিনখানা ঘর ভাড়া লইয়া সাহেব থাকেন। বেহারা ২।৩ জন দেখিলাম। সম্মুখের ড্রইং রুমে গিয়া বসিলাম এবং চাপরাশীর হাতে কার্ড পাঠাইয়া দিলাম। ২।১ মিনিটের মধ্যে সাহেব ত্রস্তভাবে লুজ্ পোষাকে আমার কাছে আসিয়া আমার করমর্দ্দন করিল। আমি বলিলাম "আমি ব্রহ্মচারী ঠাকুরের নিকট হইতে আসিয়াছি।

সা। আমি তাহা জানি—আমরা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি যে তুমি আসিতেছ—আমরা তোমার জন্যই অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছি।

আ। আর কেহ না আসিয়া আমিই যে আসিতেছি, তাহা কি প্রকারে জানিলেন? আমাকে কি আপনাদের স্মরণ আছে?

সা। কারণ জানিয়া দরকার কি? তুমিই আসিতেছ তাহা জানিতে পারিয়াছি, তুমিই তো ল-ইয়ার? আমরা ভোর ৪টায় উঠিয়া সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া তোমার জন্যই এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছি, এখন প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইব।

তখন আমি ঠাকুরের কথা সাহেবকে বুঝাইয়া দিলাম।

সা। আমাদের আর কোন বিবেচনা করিবার আবশ্যক নাই, আমরা এখনই যাইতে প্রস্তুত আছি। যখন যাইতে বলিবেন তখনই প্রস্তুত আছি। আমরা ৩ মাস যাবৎ চিন্তা করিয়াছি, আর কিছুই ভাবিবার নাই।

আ। আমি মাত্র ঠাকুর যাহা বলিয়া দিয়াছেন তাহা আপনাদিগকে বলিতে আসিয়াছি। আমি আজ্ঞাবহ মাত্র, আমি নিজে আপনার কথার কোনই উত্তর দিতে পারিব না, আমি তাঁহাকে যাইয়া আপনাদের কথা বলিব, তিনি যাহা বলেন আপনাদিগকে তাহা জানাইব।

সা। আচ্ছা অতি উত্তম, তাহাই হইবে।

সন্ধ্যার সময় ঠাকুরকে গিয়া সাহেবের কথা জানাইলাম তখন বাবু হেমেন্দ্রনাথ মিত্র ওখানে ছিলেন।

ঠাকুর বলিলেন "যদি উহাদের দীক্ষা হয় তাহা হইলে একজন ভাল দোভাষীর দরকার হইবে"।

হেমেন্দ্রবাবু বলিলেন "যদি সন্ধ্যার সময় হয় তাহা হইলে আমি থাকিতে পারি"।

ঠাকুর। তাহা হইলে অতি উত্তম হয়।

আমাকে বলিলেন—"তুমি এখনই গিয়া সাহেবকে বল যে দীক্ষার জন্য শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে, তাহা তাহাদিগকে জানান হইবে; সেই পর্য্যন্ত তাহাদিগকে অপেক্ষা করিতেই হইবে। তবে যে সময় হইবে, তখন তাহাদের অসুবিধা হইবে না, খুব সম্ভব রাত্রেই হইবে এবং ইণ্টারপ্রেটারের কার্য্য একজন খুব গণ্যমান্যব্যক্তি করিবেন"।

আমি ৭৷৷০টার সময় গ্র্যাণ্ড হোটেলে যাইয়া দেখিলাম যে উহাঁরা দুই জনেই বেড়াইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন, আমি আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া ঐ কথাগুলি একটু কাগজে লিখিয়া বেহারার হাতে দিয়া সাহেবকে দিবার জন্য বলিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম।

১লা ফেব্রুয়ারী—

কাছারীতে সেসন কোর্টে একটী মোকর্দ্দমা কয়দিন পর্য্যন্ত করিতেছি। ১১টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত জজ কার্য্য করেন, তাহার পর বাসায় আসিয়া ঠাকুরের কাছে যাইতে রাত্রি হইয়া যায়। অদ্য ৩টার সময় আমার ভাই ধীরেন আসিয়া সংবাদ দিল যে ঠাকুর আমাকে কাছারী হইতে বরাবর তাঁহার ওখানে যাইতে বলিয়া দিয়াছেন। আমার গাড়ী দুপুর বেলা স্ত্রীকে লইয়া ঠাকুরের কাছে গিয়াছে আজ আর আসিবে না। কি প্রকারে কাছারী

হইতে তাড়াতাড়ি যাইব এই সকল কথা ভাবিতেছি, এমন সময় ঠিক ৪টার সময় হঠাৎ সেদিনকার মত কোর্ট ছুটী হইল। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিবামাত্রই দেখি যে, আমার এক উকীল বন্ধু মোটরে করিয়া তাহার বাড়ী হ্যারিসন রোড যাইবার জন্য প্রস্তুত, আমি তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিতেই আমাকে সঙ্গে লইলেন—ঠিক ৪৷৷৹টার সময় ঠাকুরের নিকট অপ্রত্যাশিতভাবে উপস্থিত হইয়া গত রাত্রের কথা বলিলাম।

ঠাকুর বলিলেন—"দেখা না হওয়া ভালই হইয়াছে, কিন্তু যাহা লিখিয়া রাখিয়া আসিয়াছ, তাহা আবার অন্য লোকে পড়িয়া না দেখে"।

আমি বলিলাম "না তাহার কোন সম্ভাবনা নাই—তখন ঠাকুর বলিলেন "অদ্যই রাত্রি ৯টার সময় সাহেবদের দীক্ষা হইবার শুভ সময় আছে, তুমি এখনই গিয়া তাহাদিগকে ইহা বলিয়া আইস, এবং তাহাদের ঐ সময় আসা সুবিধা হইবে কি না তাহা আমার সন্ধ্যার পূর্ব্বেই জানা আবশ্যক, কারণ সেই অনুসারে বন্দোবস্ত করিতে হইবে"।

আমি। আমি তাহা হইলে এখনই যাইয়া উহাঁরা কি বলেন জানিয়া ভবানীপুরের বাসায় যাইয়া ধীরেনকে দিয়া সংবাদ পাঠাইতে পারি।

ঠা। তাহা হইতে পারে, কিন্তু সংবাদ আমার সন্ধ্যার পূর্ব্বেই জানা আবশ্যক এবং এই কথা খুব গোপন থাকা দরকার। ধীরেনকে মুখে কিছু না বলিয়া লিখিয়া দিতে পার।

আ। আমিই এখন ট্রামে যাইয়া উহাঁরা কি বলেন জানিয়া আপনাকে সংবাদ দিতে পারি, যদি উহাঁরা আসিতে পারেন তাহা হইলে বাসায় যাইয়া আবার উহাঁদের লইয়া আসিব।

ঠা। তাহা হইলে খুব ভাল হয়—তুমি এখনই যাইয়া আমাকে সংবাদ দিয়া যাও।

হেমেন্দ্রবাবু সেইখানেই বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে ঠাকুর বলিলেন, "৯টার পূর্ব্বে কিছুতেই হইবে না; আপনি অসুস্থ—আপনার পক্ষে অত রাত্রি পর্য্যন্ত থাকা কষ্টকর হইবে—দোভাষীর কার্য্য ইহারাই করিবে"।

হেমেন্দ্রবাবু বলিলেন "অত রাত্রি পর্য্যন্ত থাকা আমার সম্ভব হইবে না"।

আমি তাড়াতাড়ি ট্রামে উঠিলাম এবং গ্রাণ্ড হোটেলের ফটকের কাছে পৌঁছিবামাত্র দেখিলাম যে সাহেব ও মেম বেড়াইতে বাহির হইতেছেন, আর এক মিনিট পরে আসিলে আর তাঁহাদের দেখা পাইতাম না, আমি তাঁহাদিগকে ঠাকুরের কথা বলিলাম। তাঁহারা ৯টার সময় যাইতে সম্মত হইলেন এবং আমাকে ৮॥০টার সময় ওখানে আসিতে বলিলেন।

আমি বলিলাম যে আমাকে এখনই ঠাকুরকে গিয়া সংবাদ দিয়া আসিতে হইবে এবং তাহার পর বাসায় গিয়া খাওয়া দাওয়া করিয়া বাসা হইতে তাঁহাদের লইয়া যাইতে হইবে। তখন সাহেব আমাকে তাঁহার গাড়ী খানি দিয়া বলিলেন "তুমি ইহাতে উঠিয়া প্রথম মির্জাপুর ষ্ট্রীটে যাইয়া তোমার বাসায় যাও, তাহা না হইলে তোমার বড় কষ্ট হইবে।

আমি আপত্তি করিলাম, কিন্তু সাহেব শুনিলেন না। অগত্যা তাঁহার গাড়ী লইয়া ঠাকুরকে সংবাদ দিয়া বাসায় আসিলাম এবং খাওয়া দাওয়া করিয়া ঠিক ৮॥০টার সময় গ্র্যাণ্ড হোটেলে আসিলাম। দেখিলাম তাঁহারা প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন। আমরা তখন গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ীর মধ্যে মেম সাহেব আমাকে বলিলেন, "দেখ আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি যে আমি মনোনীত হইব—আমি কল্য ট্রান্সের মধ্যে দেখিয়াছি যেন কতকগুলি যোগী এক সঙ্গে বসিয়া আছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে একজনের নিকট আর সকলে আমাকে উপদেশ নিতে বলিতেছেন"।

আমি বলিলাম "সেই যে একজন দেখিয়াছেন তাঁহাকে দেখিতে কি ব্রহ্মচারী ঠাকুরের মত দেখিয়াছেন"।

যে। তাহা ঠিক বলিতে পারি না।

ঠিক ৮-৫৫ মিনিটের সময় মির্জাপুর ষ্ট্রীটে পৌছিলাম। ঠিক ৯টার সময় ঠাকুর আমাদিগকে উপরে ডাকাইলেন। দেখিলাম আসনের উপর ঠাকুর ধূপ জ্বালাইয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। সম্মুখে টবে বসান একটী তুলসী গাছ। তাহার ঠিক সম্মুখে একখানি কম্বলের আসনের উপর ঠাকুর সাহেব ও মেমকে বসিতে সাদরে ও সহাস্যে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার দক্ষিণ দিকে একখানি আসনে আমাকে বসিতে বলিলেন ও বাম দিকে একখানি আসনে মেমসাহেবের কাছে দুইটী গুরুভগ্নী আসিয়া বসিলেন। পর্দ্দার আড়ালে আরও কয়েকটী গুরুভাই বসিয়াছিলেন। সাহেব ও মেম ঠিক আমাদের মত আসনে বসিলেন। মেম বেশ সহজভাবে বসিলেন—সাহেবের একটু অসুবিধা হইল বলিয়া বোধ হইল। ঠাকুর তখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া গম্ভীর স্বরে স্তোত্রাদি পাঠ আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং প্রণবধ্বনি করিতে লাগিলেন। উহাঁরা স্থির হইয়া শুনিতে লাগিলেন। স্তোত্রাদি পাঠ শেষ হইলে ঠাকুর একটী একটী করিয়া বিধি-নিষেধ এবং উপদেশগুলি বলিতে লাগিলেন যথা ঃ—

১। সর্ব্বদা সত্য প্রতিপালন করিবে। মনে যাহা যথার্থ প্রতীতি হবে—তাহাই সত্য ব'লে গ্রহণ করিবে। সত্য রক্ষা করতে হলে মিথ্যা কল্পনা, বৃথা চিন্তা পরিত্যাগ করতে হয়। না হ'লে সত্য বলা যায় না।

২। কাহারও নিন্দা করিবে না। পরনিন্দা মহাপাপ; নরহত্যা অপেক্ষাও গুরুতর পাপ।

৩। পিতামাতার সেবা করিবে। যাহাদের পিতামাতা বর্ত্তমান তাহারা ভাগ্যবান। আর যাহাদের পিতামাতা বর্ত্তমান নাই তাহারা প্রতিদিন পিতামাতার উদ্দেশে তর্পণ করিবে।

৪। বীর্য্যধারণ করিবে। বীর্য্য রক্ষা না হ'লে সত্য প্রতিপালন হয় না। উহা দ্বারা সাধনের বিশেষ সাহায্য হয়। যাঁহারা গৃহী তাঁহারা

ঋতুকালে স্ত্রীসহবাস করিবেন। অযথা যাঁহারা বীর্য্য নষ্ট করেন তাঁহারা পিতৃমাতৃঘাতী। বীর্য্য রক্ষা দ্বারা মনের একাগ্রতা ও শরীরের সুস্থতা লাভ হয়। বীর্য্য রক্ষা না হ'লে সাধনে উৎসাহ থাকে না। সাধনের উপকারিতাও অনুভব হয় না।

৫। প্রতিদিন কিছু দয়ার কার্য্য করিবে।

৬। শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম কর্‌তে চেষ্টা কর্‌বে। ইহাই আমাদের সাধন। প্রত্যেকটী শ্বাসপ্রশ্বাস যেমন ফেলা হচ্ছে—নেওয়া হচ্ছে, তেমন উহার প্রতি লক্ষ্য রেখে সর্ব্বদা নাম কর্‌বে।

এইগুলি সাধনের বিধি।

এখন নিষেধ বলা হচ্ছে।

১। মাংস, উচ্ছিষ্ট ও মাদক সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে। কঠিন রোগে সুচিকিৎসকের ব্যবস্থা মত মাংস, মাদক ব্যবহার করা যায়। শুধু ঔষধরূপে। প্রয়োজন শেষ হওয়া মাত্র আবার ত্যাগ করিতে হইবে। মৎস্য আহারে নিষেধ নাই। বিধিও নাই। যার যেমন ইচ্ছা। উচ্ছিষ্ট সর্ব্বদাই ত্যাগ করিতে হইবে। পিতামাতা পরম গুরু; তাঁহাদের ভুক্তাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট নয়। প্রসাদ জ্ঞানে উহা গ্রহণ করিলে উপকারই হয়। উচ্ছিষ্ট জ্ঞান হইলে উহাও ত্যাগ করিবে। পাঁচ বৎসরের অধিক যাহাদের বয়স তাহাদেরই উচ্ছিষ্ট হয়। যেসব শিশুদের ভালমন্দ জ্ঞান হয় নাই—তাহাদের উচ্ছিষ্ট তত অনিষ্টকর হয় না।

২। কোন প্রকার দলে বা সম্প্রদায়ে বদ্ধ থাকিবে না। যেখানে পরমেশ্বরের নাম, যেখানে ধর্ম্মের কোনপ্রকার অনুষ্ঠান, সেইখানেই ভক্তি-পূর্ব্বক নমস্কার করিবে। সকল ধর্ম্মার্থীদেরই আদর করিবে। কোন সম্প্রদায়কেই অনাদর করিবে না। আমাদের কোন দল বা সম্প্রদায় নাই।

৩। স্ত্রীলোক্ক হইতে সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবে। তাহাদের সঙ্গে এক ঘরে সাধন করিবে না। নির্জ্জনে কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে বসিবে না।

৪। যথাসাধ্য পরোপকার করিবে। কোনপ্রকার হিংসা করিবেনা একটা বৃক্ষের পাতাও বিনা প্রয়োজনে ছিঁড়িতে নাই। কাহারও মনে বৃথা কষ্ট দিবে না ইত্যাদি—আমি তাহা ইংরাজী করিয়া বলিতে লাগিলাম। ঠাকুরের ভাষা ও ভাব ইংরাজীতে ঠিক ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া অত্যন্ত কঠিন কার্য্য। আমার সকল জায়গায় ঠিক অনুবাদ হইতেছে না দেখিয়া ঠাকুর যোগেশদাদাকে ডাকিলেন, তখন যোগেশদাদা পর্দ্দার আড়াল হইতে আসিয়া ঠাকুরের বামদিকে বসিলেন এবং দুই জনেই বুঝাইতে লাগিলাম। তখন ঠাকুরনাম বলিয়া দিলেন এবং প্রাণায়াম দেখাইয়া দিলেন।

সাহেবের প্রাণায়াম অতি সুন্দর হইল, মেমেরও মন্দ হয় নাই। প্রথম-দিন এমন সুন্দরভাবে প্রাণায়াম করিতে আর কাহাকেও দেখি নাই। ঠাকুর বারংবার উহাঁদিগকে নাম শুনাইতে লাগিলেন। মেমসাহেব অতি সহজ সরল ভাবে ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া থাকিলেন। ১০॥০টার সময় দীক্ষা শেষ হইল। যাইবার সময় ঠাকুরের করমর্দ্দন করিয়া বাহিরে আসিলেন। আসিয়াই মেমসাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, Is that the way of making Salam ? (সেলাম করিবার কি এই রীতি ?)

আমি বলিলাম "আপনি যাহা করিয়াছেন তাহাই ঠিক হইয়াছে—আমরা পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করি।"

তখন আমরা তিনজনে গাড়ীতে উঠিলাম, উহাঁরা আমাকে ভবানী-পুরের বাসা পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া গেলেন। গাড়ীর মধ্যে মেম সাহেব সাহেবকে বলিলেন "প্রাণায়াম করিলে গলার স্বর কিরূপ সুস্পষ্ট ও সুমিষ্ট হয়, দেখিলে গুরুর স্বর কেমন মিষ্ট"—

ঠাকুর আমাকে বলিলেন, "জিতেন, এই সকল লিখিয়া রাখিও" আমি সেইদিনই এই সকল লিখিয়া রাখিয়াছিলাম এবং এক কপি ঠাকুরকে দিয়া-ছিলাম, ঠাকুর বলিলেন "ঠিক হইয়াছে।"

দোলের উৎসব

গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিজয় বিশ্বাস দাদা কীর্ত্তন করিতে পারিতেন, ঠাকুর তাহার কীর্ত্তন শুনিয়া খুব উৎসাহ দিতেন। ৩রা মার্চ্চ দোলের দিন। ঠাকুর বিজয়দাদাকে ডাকিয়া বলিলেন "তোমরা দোলের কীর্ত্তন করনা কেন ?" এই বলিয়া নিজেই মহাজনের পদাবলী হইতে দোলের একটী পালা গ্রথিত করিয়া দিলেন। সমস্ত দিন বিজয় এবং অন্যান্য গুরুভ্রাতা মিলিয়া উহার সুর আয়ত্ত করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পর দোলের উৎসবের আয়োজন হইল। ঠাকুর মধ্যস্থলে আসনে বসিলেন, আমরা সকলে তাঁহার সম্মুখে বসিলাম—বিজয়দাদা কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কীর্ত্তন খুব জমাট বাঁধিল। ঠাকুর চক্ষু বুজিয়া শুনিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সকলে চতুর্দ্দিকে আবির ছড়াইতে লাগিল। ঘরটী লালে লাল হইয়া গেল। ঠাকুর ঐ অবস্থায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আমরাও সকলে দাঁড়াইয়া উঠিলাম। ঠাকুর নৃত্য করিতে করিতে এবং হরিবোল হরিবোল বলিতে বলিতে একেবারে আমাদের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। আমরা সকলে ধরা-ধরি করিয়া ঠাকুরকে মাথায় করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলাম। সকলের কি আনন্দ! কি অদ্ভুত দৃশ্য! সেই অবধি প্রতি বৎসর দোলের উৎসব হয়, কিন্তু ঐরূপ আনন্দ আর কখনও হয় নাই।

নামের মাহাত্ম্য

একদিন বিকাল বেলা ঠাকুর ও তাঁহার গুরুভ্রাতা প্রসিদ্ধ কীর্ত্তন গায়ক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন মহাশয় বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। আমিও সেখানে গিয়া বসিলাম। দেখিলাম উহাঁরা নামের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, "একমাত্র নাম করিতে পারিলেই সব হইয়া যায়। রেবতী কাকা বলিলেন, "হেলায় শ্রদ্ধায় ভগবানের নাম করিলেও ফল হয়, এবং শুনিলেও কাজ হয়, এই জন্যই আমি উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করি" এই বলিয়া পদ্মপুরাণের একটী শ্লোক বলিলেন এবং সেই শ্লোকের অনুবাদ করিয়া তিনি নিম্নলিখিত গানটী গাহিয়া থাকেন বলিলেন—

মধুর মধুর অতি সুমধুর কৃষ্ণমঙ্গল গানরে!
স্মরণ, মনন শ্রবণ মঙ্গল, মঙ্গল নিদানরে!
শুদ্ধ সত্ত্ব শাশ্বত ঘন কেবল চিন্ময় ধামরে।
(সকলি আছে, এই গোবিন্দ নামে সকলি আছে)
বেদ বেদান্ত পুরাণ ভাগবত, গোবিন্দ নামে সকলি আছে।
হেলায় শ্রদ্ধায় যেবা রসনায় গোবিন্দের নাম লয়রে,
হোক্ দুরাচার, জগতের ছার ভবনীরে পার পায়রে।
ইত্যাদি—ইত্যাদি—

বলিলেন "পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতা যাহার কানে নাম ঢুকে তাহারই উহাতে উপকার হয়" ঠাকুর তাঁহার কথার অনুমোদন করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে ঠাকুর পুরী চলিয়া গেলেন।

———

হেমেন্দ্রবাবুর দেহত্যাগ

কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত গোঁসাইএর জন্মোৎসব, হেমেন্দ্রবাবু তাঁহার মনোহর পুকুরের বাগানে খুব জাঁকজমকের সঙ্গে করিয়া আসিতেছেন। এবার তাঁহার শরীর বড়ই কাতর। ঠাকুর কিছু পূর্ব্বে কলিকাতায় ঝামাপুকুরে ইঞ্জিনিয়ার ক্ষিতিশ দাদার বাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। হেমেন্দ্রবাবুর বাগানে এবার ঠাকুর বিশেষভাবে উৎসবে যোগদান করিলেন—আমরাও সকলে গিয়াছিলাম। হেমেন্দ্রবাবু অত্যন্ত পীড়িত অবস্থায়, অতি কষ্টে আসিয়া ছিলেন। ইহাই তাঁহার শেষ উৎসব। অল্পদিন পরেই তাঁহার দেহত্যাগ হইল। তাঁহার পুত্র হীরেন্দ্র (পাগল) আমাদের গুরুভাই—রোজ ঠাকুরের নিকট গিয়া রোগের বিবরণ জানাইত। ঠাকুরও মধ্যে মধ্যে দেখিতে আসিতেন। যে রাত্রে তাঁহার মৃত্যু হইল, তাহার পরদিন পাগল ঠাকুরের কাছে গেলে, ঠাকুর তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন "হেমেন্দ্রবাবুর দেহত্যাগের কথা আমি কাল রাত্রেই টের পাইয়াছি। রাত্রি প্রায় ১২টার সময় একটা পাখী আমার সম্মুখে বারান্দায় আসিয়া বড় কাতরভাবে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল, একটু পরে উড়িয়া গেল। আমার কেমন মনে হইল, হেমেন্দ্রবাবু নাই—আমি আজ সকালে স্নানের সময় গঙ্গায় তাঁহার কল্যাণে তর্পণ করিয়াছি। এইবারই হেমেন্দ্রবাবুর প্রতিবেশী এবং পুত্র স্থানীয় অন্নদা দাসের দীক্ষা হইল।

লক্ষ্মীপূর্ণিমায় চন্দন নগরে ঠাকুরের রন্ধন

মহামোহের পর লক্ষ্মীপূর্ণিমা পর্য্যন্ত ঠাকুর চন্দন নগরেই থাকেন। বহুদিন হইতে ঠাকুর লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিন আশ্রমবাসী সকলকে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাওইয়া থাকেন। এবারে লক্ষ্মীপূর্ণিমার সময় আমি কলিকাতা ছিলাম। ঠাকুর এবার বিশেষ করিয়া সকলকে সেইদিন চন্দননগর যাইতে বলিয়া দিয়াছেন। আমিও গেলাম। দেখিলাম খোলা উঠানে মস্ত বড় উনানে ঠাকুর নিজে লাফরা রন্ধন করিতেছেন। আস্ত আস্ত বেগুন, আলু, কুমড়া ইত্যাদি দিয়া প্রায় ১০০ শত লোকের জন্য তরকারী রন্ধন করিলেন। আমরা সকলে অমৃতের মত সেই প্রসাদ পাইলাম। ঠাকুর সকলের নিকটে গিয়া যত্ন করিয়া খাওয়াইলেন।

১৯২৪ সাল ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বর গমন

৯ই ফেব্রুয়ারী সরস্বতী পূজার দিন আমরা ঠাকুরকে লইয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে যাইব স্থির করিলাম। বড়বাজার হইতে শিবতলা পর্য্যন্ত ষ্টীমারে এবং সেখান হইতে প্রায় ১৷৷০ মাইল হাঁটিয়া সকলে ঠাকুরের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী গেলাম। মা কালীর মন্দিরের মধ্যে গিয়া ঠাকুর অনেকক্ষণ করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং ষোড়শোপচারে পূজা দিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের থাকিবার ঘরে গিয়া সাষ্টাঙ্গ দিলেন। তাহার পর পঞ্চবটীর মূলে গিয়া আসন করিয়া বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন এবং এক ঘণ্টাকাল বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া বসিয়া রহিলেন। আমরাও সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম। স্থানটী সুন্দর নির্জ্জন। ঠাকুর বলিলেন "সাধন ভজনের বড় উপযুক্ত স্থান।

তাহার পর একটা ঝোপের পাশে গিয়া সকলে কিছু জলযোগ করিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

চন্দননগরে শিবরাত্রি

৩রা মার্চ্চ শিবরাত্রি। ঠাকুর চন্দননগরে আছেন। আমরা সকলে সন্ধ্যার সময় সেখানে গেলাম। ঠাকুর সমস্ত দিন উপবাস করিয়া, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া, ৪ প্রহরে ৪ বার হোম করিয়া থাকেন, এবং অন্য সময়ে স্থির হইয়া আসনে বসিয়া থাকেন। সেবারেও ঠাকুর চন্দননগরের বাহিরের উঠানে বসিয়া ঐরূপ করিলেন। আমরা সকলে কিছুদূরে বসিয়া আছি। প্রায় রাত্রি দুইটার সময় অনেকের নিদ্রা আকর্ষণ হওয়ায়, আমরা কেহ কেহ গল্প গুজব আরম্ভ করিয়া দিলাম, ঠাকুরের কর্ণে উহা প্রবেশ করিতেই তিনি উঠিয়া আসিয়া আমাদিগকে খুব ধমক দিয়া বলিলেন—

"এই সকল শুভ মুহূর্ত্তে স্থির হইয়া বসিয়া নাম করিতে হয়। ইহা গল্প গুজবের সময় নয়। এইরূপ শুভ সময় আর পাইবে না। তোমাদের একটু কাণ্ডাকাণ্ডি জ্ঞান নাই। শুভ সময় তোমরা হেলায় নষ্ট করিতেছ।"

অল্পরাত্রি থাকিতে আমরা সকলে ঠাকুরের সঙ্গে গঙ্গায় স্নান করিয়া আসিয়া জলযোগান্তে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

১৯২৫ সাল

অন্নদার বাড়ীতে সাধন-বৈঠক

ভবানীপুরের গুরুভ্রাতাদের কলিকাতা বৈঠকে যোগদান করা সকল সময় সুবিধা হয়না বলিয়া অন্নদাদাদা ঠাকুরের অনুমতি লইয়া প্রতি শনিবার তাহার বাড়ীতে বৈঠকের ব্যবস্থা করিল। ১৭ই জানুয়ারী খুব সমারোহের সহিত তাহার ভবানীপুরে নূতন বাড়ীতে প্রথম বৈঠক সম্মেলন হইল। অনেক গুরুভ্রাতারা আসিলেন। বিজয়দাদা খুব সুন্দর কীর্ত্তন করিলেন। এখন হইতে প্রতি শনিবার আমি বৈঠকে পাঠ করিবার ভার লইয়াছি এবং অতি সুচারুরূপে বৈঠকের কার্য্য হইতেছে।

অন্নদাদাদার ঐকান্তিক আগ্রহ ও যত্নের তুলনা নাই। আমাদের পরিতুষ্টির জন্য প্রাণ ঢালিয়া দিত এবং মধ্যে ২ অনেক টাকা ব্যয় করিত।

ঠাকুরের কালাজ্বর—পদ্মানদীতে বোটে অবস্থান

কাশী হইতে অল্প অল্প জ্বর লইয়া ঠাকুর ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি কলিকাতা আসিলেন। এখানে আসিয়া জ্বর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং প্লীহা বড় হইল। ডাক্তার রক্ত পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, কালাজ্বর হইয়াছে। খুব ধরাকাটা করিয়া চিকিৎসা আরম্ভ হইল। হরিশ ডাক্তার ৬ মাসের ছুটী লইয়া চিকিৎসার ভার লইল। নীলরতনবাবু প্রভৃতি বড় বড় ডাক্তার আসিতে লাগিলেন। জ্বরের কিছুতেই উপশম হয় না। ঠাকুর বলিলেন, তিনি বোটে করিয়া পদ্মানদীতে কিছুদিন থাকিবেন। বোটের যোগাড় হইল। মার্চ্চ মাসের শেষে ঠাকুর গোয়ালন্দ হইতে বোটে উঠিয়া পদ্মানদীর মধ্যে থাকিলেন। আমি ইষ্টারের ছুটীর সময় ঠাকুরকে দেখিতে গিয়াছিলাম—তখন দীঘির পাড়ের কাছে ছিলেন। বোটেও বিশেষ কিছু উপকার পাইলেন না। জ্বর যেরূপ হয় তাহাই হইত। শেষে শুনিলাম ঐ জ্বর লইয়াই ঠাকুর ব্রহ্মপুত্রে নাঙ্গল বন্ধ যোগের সময় খুব স্নান করিলেন এবং ২৬শে এপ্রিল কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, স্নানের পর হইতেই জ্বর কমিতে লাগিল এবং আস্তে আস্তে সুস্থ হইলেন। ৩রা মে পুরী চলিয়া গেলেন।

১৯২৫ সাল

ঠাকুরের কালিয়া গমন

১৯২৫ সালের আগষ্ট মাসে, প্রায় ৬ মাসকাল জীবন সঙ্কট কালাজ্বর রোগে ভুগিয়া, পদ্মানদীর উপর ২মাস বোটে অবস্থান করিয়া, পুরী হইতে বেশ সুস্থ হইয়া, ঠাকুর কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীটে আসিলেন। সঙ্গে ছোট জ্যেঠা মহাশয় শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় (ঠাকুরের "ছোরদাদা") আসিলেন। তাঁহার শরীর বড়ই কাতর—চিকিৎসার জন্য আসিয়াছেন। আমার বহুদিনের সঞ্চিত ইচ্ছা ছিল যে ঠাকুরকে একবার আমাদের দেশে (কালিয়াতে) লইয়া যাইব। একবার তাঁহাকে আমার এই ইচ্ছা জানাইয়াছিলাম, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন "আচ্ছা যাইব"। তাহার পর নানাপ্রকার বাধাবিঘ্নতে এতদিন কিছু করা যায় নাই। কেবল হৃদয়ে আশা পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম মাত্র। এবার ঠাকুরের শরীর বেশ সুস্থ হইয়াছে দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল, এবং হরিশ ডাক্তারকে একদিন বলিলাম যে আমার নিতান্ত ইচ্ছা এবার ৺পূজার পর ঠাকুরকে আমাদের বাড়ী লইয়া যাইব এবং আমরা দুইজনে অবসর মত ঠাকুরের কাছে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার প্রস্তাব করিলাম। হরিশদা তাহাতে বলিল যে উহা সম্ভব হইবেনা, বিশেষতঃ ছোট জ্যেঠা মহাশয়ের যেরূপ অসুখ তাহাতে বলিতেও সাহস হয় না।

ঠাকুর তখন রোজ বিকালে প্রিন্সেপঘাটে বেড়াইতে যাইতেন। আমি একদিন হরিশদাকে বলিলাম "চলুন প্রিন্সেপঘাটে যাই, সুবিধা হইলে আমাদের কথাটা বলিয়া দেখি কি বলেন"

সে বলিল "আচ্ছা বেশ, তাহাই করা যাউক।" তখন আমরা দুইজনে প্রিন্সেপঘাটে গেলাম। একটু পরে ঠাকুর আসিয়া ঘাটে আসন করিয়া

বসিলেন, আমরা সাম্‌নে ঘাসের উপর বসিলাম। ঠাকুরের সঙ্গে রেবতী কাকাও ছিলেন। আমরা চুপ করিয়া বসিয়া আছি। ছোট জ্যেঠা মহাশয়ের শরীর বড় খারাপ—চিকিৎসায় কোন উপকার হইতেছে না। ঠাকুর ইহা বলিতে লাগিলেন দেখিয়া আমাদের প্রস্তাব উত্থাপনের সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হইলাম। আমি হরিশদাকে কানে কানে বলিলাম যে এ অবস্থায় আর প্রস্তাবই করা যায় না। হরিশদাদাও অনুমোদন করিল। তাহার অল্প একটু পরেই ঠাকুর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—

"জিতেন, তোমাদের দেশের B. N. Ryএর কোন একটা বড় ষ্টেশনে civil surgoen কি দাশগুপ্ত আছেন, তাঁহাকে চেন? আমার নামটা মনে হইতেছে না। তাঁহার স্ত্রী দীক্ষা-প্রার্থী হইয়া আমাকে চিঠি লিখিয়াছেন। কে তুমি বলিতে পার?"

আমি। একটু চিন্তা করিয়া বলিলাম "হ্যাঁ, আমি চিনিয়াছি, তিনি আমাদের আত্মীয়া। আমার দাদার মাসিমা।

ঠাকুর। তোমাদের দেশে অনেক শিক্ষিত লোক আছেন। সবই বুঝি দাশগুপ্ত, সেনগুপ্ত—আরও কত দাশগুপ্ত, সেনগুপ্ত আমার কাছে চিঠি লেখেন।

আমি। আমাদের দেশে প্রায় ৩০০।৪০০ ঘর বৈদ্যের বাস আছে। পূজার সময় প্রায় সকলেই বাড়ী আসে। গ্রামখানিও বেশ বড়—স্বাস্থ্যও বেশ ভাল।

ঠাকুর। আমার তো খুবই ইচ্ছা একবার তোমাদের দেশে যাই। লক্ষ্মী পূর্ণিমার পর আমার বেশ সুবিধার সময়। তখন একবার পূর্ব্ববঙ্গের দিকে ঘুরিয়া তোমাদের ওদিক হইয়া আসিলে ভাল হয়। কিন্তু কি করিব? ছোর্‌দাদার যে অসুখ

উহাঁকে তো আর ফেলিয়া যাওয়া যায় না। রোগের একটু উপশম না হইলে হয় না।

আমাদের প্রত্যাশিত প্রস্তাব ঠাকুর আপনা হইতেই উথাপন করিলেন এবং আমাদের মনের কথা বুঝিয়াই ঐরূপ বলিলেন ভাবিয়া বড় আনন্দিত হইলাম এবং উৎসাহিত হইয়া বলিলাম।

"আমার অনেক দিনের আন্তরিক ইচ্ছা একবার আপনাকে আমাদের বাড়ী লইয়া যাই। আমাদের গ্রামে অনেক সাধনের লোক প্রতি বৎসর আপনাকে সেখানে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে বলিয়া থাকেন। আপনার সুবিধা হইবে কিনা, সেইজন্য আমি বলিতে সাহস পাই নাই। আমাদের বাড়ী বেশ বড়—প্রায় ৫০ জন লোককে স্থান দিতে পারি। হরিশ ডাক্তারের বাড়ীও আমাদের বাড়ী একেবারে পাশাপাশি।

ঠা। আমার তো খুবই ইচ্ছা। ছোর্‌দাদার অসুখ একটু না কমিলে বলিতে পারি না—দেখা যাউক কি হয়।

পূজার সময় সপরিবারে বাড়ী গিয়া নির্ব্বিঘ্নে পূজার কার্য্য সমাধা করিলাম। পূজা অন্তে কলিকাতার খবর জানিবার জন্য হরিশদাদাকে চিঠি লিখিলাম এবং লক্ষ্মী পূর্ণিমার পর ঠাকুরের আসিবার সম্ভাবনা আছে কিনা জানিতে চাহিলাম। হরিশদা চিঠির উত্তর দিয়া লিখিলেন—ঠাকুর চতুর্থীর দিন রওনা হইয়া পঞ্চমীর দিন আমাদের বাড়ীতে পৌছিবেন। সঙ্গে ৩০।৩৫টী গুরু ভাই থাকিবেন। সেই অনুসারে সমুদয় যোগাড় করিতে লিখিলেন। আমি ও বসন্তদা (আমাদের পুরোহিত এবং গুরুভাই) কয়েক দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম। সমস্ত বাড়ী চুনকাম করা হইল, ছাদের উপর, চণ্ডিমণ্ডপের সাম্‌নে সামিয়ানা খাটান হইল। যেন বাড়ীতে আবার পূজা হইবে।

চতুর্থীর দিন টেলিগ্রাম পাইলাম ঠাকুর ২৫।৩০টী গুরু ভাই সহ কল্য সকালে আসিয়া পৌছিবেন। আমি ঐদিন ষ্টীমারে তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া আনিবার জন্য খুলনা গেলাম। হরিশদা বরাবর চিঠি লিখিতেছেন যে, ষ্টীমারখানা যেন বাজারের ঘাটে ষ্টেশনে লাগাইয়া, ঠাকুরকে লইয়া আবার আমাদের বাড়ীর ঘাটে লাগান হয়। কারণ ষ্টেশন হইতে আমাদের বাড়ী প্রায় ১ মাইল দূর। রৌদ্রে ঠাকুরের হাঁটিয়া যাইতে কষ্ট হইবে, কারণ তাঁহার শরীর তখনও খুব দুর্ব্বল। এজেণ্ট সাহেবের অনুমতি না হইলে এক ষ্টেশনে দুই জায়গায় লাগাইবার সাধ্য নাই। আমি খুলনায় যাইয়া প্রথমেই এজেণ্ট সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া ষ্টীমার আমাদের বাড়ীর ঘাটে লাগাইবার প্রস্তাব করিলাম। সাহেব প্রস্তাব শুনিয়া প্রথমটা বিশেষ চটিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন যে এক ষ্টেশনে দুইবার লাগান অসম্ভব। তখন আমি কেবল বলিলাম যে একজন সাধুর সুবিধার জন্য তাঁহাকে এই সামান্য অনুরোধটুকু করিতেছি—তিনি ইহা রক্ষা না করিলে আর আমি কি করিতে পারি। কি জানি একটু পরেই সাহেব কি ভাবিয়া রাজি হইলেন, এবং তখনই সাব-এজেণ্টকে ডাকিয়া আমাদের ঘাটে ষ্টীমার লাগাইবার আদেশ দিয়া দিলেন। আমি সমস্ত রাত্রি প্লাটফরমএ না ঘুমাইয়া পড়িয়া রহিলাম। প্রাণে সে কি উৎসাহ!

যথাসময়ে শেষ রাত্রি ৪টার সময় ট্রেণ আসিল। ঠাকুর গাড়ী হইতে নামিলেন। সঙ্গে প্রায় ২৫জন গুরুভ্রাতা যথা, মহানন্দ দাদা, জিতুদা, চুনি দাদা, পরাণ দাদা, বঙ্কু দাদা, অন্নদা দাদা, ইন্দু দাদা প্রভৃতি। সকলে গিয়া ষ্টীমারে উঠিলাম। প্রাতঃকালের মৃদু মধুর হাওয়াতে ঠাকুরকে বেশ প্রফুল্ল দেখাইতে লাগিল। বেলা ৮॥০টার সময় ষ্টীমার ঘাটে আসিল। বহু লোক ষ্টীমার ঘাটে সমবেত হইয়াছিল। সকলেই ঐ ষ্টীমারে উঠিয়া পড়িল। ষ্টীমার ছাড়িয়া আমাদের ঘাটে লাগিল। বহু জনতার মধ্যে ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে ঠাকুরকে লইয়া দলবলসহ বাড়ীতে

পৌঁছিলাম। দ্বিতলের ঘরে ঠাকুরের আসন দেওয়া হইল। খানিকক্ষণ আর লোকের ভিড় কিছুতেই থামাইতে পারি না। অতি কষ্টে লোকের ভিড় থামাইয়া ঠাকুরের হোমের যোগাড় ইত্যাদি করা হইল। সমুদয় গুরু ভ্রাতারাও স্নানাহ্নিক সমাপন করিলেন। এবং মধ্যাহ্নে মহাসমারোহ করিয়া আহারাদি সম্পন্ন করিলেন।

ঠাকুরের গুরুভ্রাতা বৃদ্ধ ৭৫ বৎসর বয়স্ক ছোট কালিয়ার শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর সেন মহাশয় সকাল বেলা আসিয়াই ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিয়া গেলেন। তাঁহার কি আনন্দ! দাদা তখন ঢাকাতে কাজ করিতেন। দাদাও দ্বিপ্রহরের ষ্টীমারে সপরিবারে ঢাকা হইতে আসিলেন। দাদাকে দেখিয়া ঠাকুর একেবারে জড়াইয়া ধরিলেন।

অপরাহ্নে চণ্ডি মণ্ডপের সাম্‌নে প্রকাণ্ড সামিয়ানার নীচে ঠাকুরের বসিবার আসন দেওয়া হইল। গ্রামস্থ বহু লোক আসিলেন। ঠাকুরও আসিয়া বসিলেন।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন "গুরুর নিকট দীক্ষা লইয়া যদি কোন উপকার না হয়, এবং বিশ্বাস না হয় তাহা হইলেও কি তাহা ধরিয়া থাকিতে হইবে?" ঠাকুর বলিলেন "যদি গুরুর উপদেশে অবিশ্বাসই হইল, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে গুরুকরণই হয় নাই। গুরুর উপদিষ্ট কার্য্যগুলি অবিচারে প্রতিপালন করিতে হইবে —ইহাই শাস্ত্রবাক্য। আর একজন জিজ্ঞাসা করিলেন "আমরা যে সকল প্রার্থনা করি 'রূপং দেহি, জয়ং দেহি' ইত্যাদি, ইহাতে কি ফল হয়?

ঠাকুর বলিলেন "উহাতেও ফল হয়। সকাম প্রার্থনা করিতে করিতেই নিষ্কাম প্রার্থনা হইয়া যায়।" ইত্যাদি প্রকার প্রশ্ন হইতে লাগিল। একজন ঠাকুরকে বলিলেন আপনি আমাদিগকে কিছু

উপদেশ দিন্। ঠাকুর বলিলেন "পরনিন্দা করিওনা, সত্য কথা বলিও ইত্যাদি বহু মামুলী উপদেশ আপনারা বহু গ্রন্থাদিতে পড়িয়াছেন। ঐরূপ বৃথা উপদেশ দিলে কিছু লাভ হয় না। আর্ত্ত হইয়া জিজ্ঞাসু হইলে, পুরাকালে সাধুরা উপদেশ দিয়া যাহা বিহিত হয় তাহা করিতেন।"

এই সময়ে শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বাবু আসিলেন উভয়ে নমস্কার ও প্রতি নমস্কার হইল। তখন যজ্ঞেশ্বর বাবু বলিলেন "আপনার নিকট আমার একটী জিজ্ঞাস্য আছে। জীবনে তো কত পাপ করিয়াছি। মৃত্যুর পূর্ব্বে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করা কি আমার বিধেয়?

ঠাকুর একটু আস্তে আস্তে তাঁহাকে বলিলেন।

"আপনি গুরুদেবের যে কৃপা পাইয়াছেন তাহাতে আপনার পক্ষে ঐ সকল প্রায়শ্চিত্তের কোন দরকার নাই। একমাত্র গুরুদত্ত নাম জপ করিলেই সর্ব্বসিদ্ধি হয়—ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তবে লোক শিক্ষার জন্য ঐ সকলের প্রয়োজন আছে। আপনি সমাজের শীর্ষ স্থানীয়। আপনি ঐ সকল না করিলে আপনার দৃষ্টান্ত দেখিয়া অনেকেই উহা করিবে না এবং ঐ সকল শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানগুলি একেবারে লোপ পাইবে—তাহাও ভাল নয়।"

সন্ধ্যা হইয়া গেল। ঠাকুরকে উপরে লইয়া গেলাম। সন্ধ্যারতি শেষ হইলে ঠাকুরের নিকট গিয়া বলিলাম। ঠাকুর বলিলেন "এখানে বিশেষ দীক্ষা প্রার্থী কেহ নাই। যে ৭।৮ জন আছে তাহাদিগকে কল্যই দীক্ষা দিয়া পরশ্ব গোপালগঞ্জে যাইব" আমার ইচ্ছা ছিল ঠাকুর অন্ততঃ চারদিন থাকেন। আমি বলিলাম "আর একদিন থাকিলে আমার তৃপ্তি হয়।"

উত্তরে ঠাকুর অত্যন্ত স্নেহ ভরে বলিলেন—

"এখানে আসিলাম, তোমাদের সঙ্গে দেখা হইল। আর আমার এখানে কোন প্রয়োজন নাই। গোপালগঞ্জে বহু নমঃশুদ্র আমার প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া আছে। সেখানে আমার অনেক কার্য্য আছে। পরশ্ব তারিখই সেখানে যাইব। তুমিও সঙ্গে চল।"

আমি আর বাধা দিতে পারিলাম না। আনন্দে আমার চক্ষের জল আসিল, বলিলাম "আপনার যাহা ইচ্ছা তাহার উপর আমার আর বলিবার কিছুই নাই। আমি কৃতার্থ হইয়াছি। আমার বাড়ী পবিত্র হইয়াছে।"

তাহার পরদিন সকালবেলা সকল গুরুভ্রাতাগণ ঠাকুরকে লইয়া নদীতে স্নান আহ্নিক তর্পণ সমাধা করিলাম। ছাদে বসিয়া সকলে পাঠ, পূজা, হোম ইত্যাদি করিতে লাগিলেন। সমস্ত বাড়ীটী যেন পুরাকালের আর্য্য মুনি ঋষিদের আশ্রমের মত স্তব মুখরিত হইল। বেলা ১০টা হইতে প্রায় ১॥০টা পর্য্যন্ত গুরুভ্রাতা হীরেন্দ্রনাথ মিত্র (হেমেন্দ্র বাবুর ছেলে) সুমধুর গোষ্ঠ কীর্ত্তন করিল। ২টার সময় সকলে মধ্যাহ্ন আহারে বসিল। সে কি স্ফুর্ত্তি! আনন্দে চীৎকার করিয়া বাড়ী মাথায় করিয়া তুলিল। চুনিদাদা "জয় গুরু মহারাজের জয়" বলিয়া ঘন ঘন চীৎকার করিতে লাগিলেন এবং "ঠাকুর বৈষ্ণবগণ" ইত্যাদি বলিয়া ধ্বনি দিতে লাগিলেন। আমার বাড়ীর চাকর জ্ঞানা বাড়ীতে অতি সুস্বাদু টাট্কা মাখন টানিয়া দিয়াছিল। উহা খাইয়া সকলে বড়ই তৃপ্ত হইল। শেষে জিতুদা উঠিবার সময় "জয় প্রফুল্লদিদিকা মাখন কি জয়" বলিয়া উঠিয়া পড়িল। ঠাকুর এতক্ষণ উপর হইতে নামিয়া আসিয়া আমাদের সঙ্গে আনন্দে যোগদান করিলেন এবং জিতুদার কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বিষম খাইবার উপক্রম হইলেন। আহারের পর ঠাকুর আমাকে বলিলেন—

"তোমাদের ভয়ানক খরচ হইতেছে! যেরূপ আয়োজন তাহাতে আমি বেশ বুঝিতেছি তোমাদের কষ্ট হইতেছে"। আমি বলিলাম "আপনি ওরূপ বলিবেন না। এইরূপ আনন্দ জীবনে আর কখনও পাই নাই, আর পাইবও না। ইহা কি অর্থ দ্বারা পাওয়া যায়, কেবল আপনার কৃপা।" ঠাকুর আমাদের এই সামান্য খরচ দেখিয়া কত ক্লেশ অনুভব করিলেন! কাহারও সামান্য কোন বিষয়ে ক্লেশ হইলে তাঁহার কত সহানুভূতি তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

বিকালে শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বাবু ঠাকুরকে তাঁহার বাটী লইয়া গেলেন এবং খুব যত্ন করিয়া সকলকে পরিতোষরূপে জলযোগ করাইয়া দিলেন। রাস্তার দুই ধারে ঠাকুরকে দেখিবার জন্য এত ভিড় হইয়াছিল, যে পথ চলা দায়। সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিলাম।

বসন্ত দা ঠাকুরকে তাহার বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য এবং গুরুভ্রাতাদের জন্য একটু জলযোগের ব্যবস্থা করিয়াছিল কিন্তু তাহারা দুইবার খাইয়া আর বসন্তের বাড়ী যাইতে রাজী হইতেছিল না। তাহা শুনিয়া ঠাকুর সকলকে ধমক দিয়া বলিলেন "তোমাদের বড়ই অন্যায়। বসন্ত প্রাণ দিয়া তোমাদের সেবা করিবার জন্য আয়োজন করিয়াছে—তোমাদের যথাসাধ্য গ্রহণ করিতে হইবে। চল আমিও যাইতেছি।" গুরুভ্রাতাগণ লজ্জিত হইয়া সকলে ঠাকুরকে লইয়া বসন্তদার বাড়ীতে গেলাম পরদিন সকাল বেলা ষ্টীমারে ঠাকুরকে লইয়া আমরা সকলে গোপালগঞ্জ রওনা হইলাম।

গোপালগঞ্জ গমন

সেইদিন বেলা ১টার সময় গোপালগঞ্জ পৌছিলাম। ষ্টেশন হইতে কীর্ত্তন করিতে করিতে ঠাকুরকে লইয়া স্কুলের হেড মাষ্টার, ঠাকুরের গুরু-ভ্রাতা শ্রীযুক্ত গিরিশ বাবুর বাংলায় আসিলাম। সম্মুখে বিস্তীর্ণ ময়দান—তাহার পরই মধুমতী নদী—দৃশ্যটী বড়ই চমৎকার। আমাদের থাকিবার জন্য বোর্ডিংএর প্রকাণ্ড টীনের ঘর দেওয়া হইল।

গোপালগঞ্জে বহু নমঃশুদ্র ভদ্রলোকের বাস। সেখানে খৃষ্টান মিশ-নারীরা অনেক নমঃশুদ্রকে খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন এবং তাহারা হিন্দু সমাজ হইতে বহির্গত হইয়া গিয়াছে। নমঃশুদ্রদেরা অস্পৃশ্য বলিয়া ব্রাহ্মণ কায়স্থ জাতিগণ ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন বলিয়াই এইরূপ হইয়াছে। বহুদিন হইতে ঠাকুর ইহার প্রতিকার করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং ইহার পূর্ব্বেও একবার গোপালগঞ্জে আসিয়া অনেক নমঃশুদ্র ভদ্রলোক-দিগকে দীক্ষা দিয়া তাহাদের কোল দিয়াছিলেন। স্কুলের শিক্ষক অমৃত-দাদা, জগবন্ধু দাদা ইত্যাদি এইরূপে পূর্ব্বেই ঠাকুরের নিকট দীক্ষা পাইয়া ছিলেন। সকলে ঠাকুরের সেবায় মগ্ন হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে পরিচয় হইল এবং তাঁহাদের সাধন অনুরাগ দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। তাঁহারা ঠাকুরকে বলিলেন যে গ্রাম হইতে প্রায় ১৫০ শত নমঃশুদ্র ঠাকুরের নিকট দীক্ষা প্রার্থী হইয়া আসিয়াছে। উহাদের মধ্যে অনেক খৃষ্টান হইয়া গিয়াছিল। ঠাকুর অমৃত দাদাকে তাহাদের নাম লিখিয়া একটী লিষ্টি করিতে বলিলেন। দলে দলে লোক আসিয়া ঠাকুরের দর্শন করিতে লাগিল। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! আমরা তিনদিন গোপালগঞ্জে ছিলাম। এই তিনদিন দীক্ষার স্রোত বহিয়া যাইতে লাগিল। শেষ রাত্রে, সন্ধ্যার

সময়—দীক্ষার আর বিরাম নাই। প্রায় ১৫০ শত নমঃশূদ্রের দীক্ষা হইল। ঠাকুর সকলকে আলিঙ্গন করিলেন এবং শুদ্ধ শান্তভাবে থাকিয়া সাধন ভজন করিতে উপদেশ দিলেন। ঠাকুরের কি দয়া! আমি প্রত্যেকটী দীক্ষা বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম। ঠাকুরের জাতি নির্ব্বিশেষ অগাধ প্রেম দেখিয়া অবাক হইলাম। মনে হইল ৪ শত বৎসর পূর্ব্বে গৌর-নিতাই যেমন আচণ্ডালে প্রেম বিলাইয়াছিলেন—যেন তাঁহারাই একাধারে আবার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমি ক্রমেই ঠাকুরের উপর আরও আকৃষ্ট হইতেছি। এইরূপে ৩ দিন কাটাইয়া ওথান হইতে নড়াইল রওনা হইলাম।

নড়াইল গমন

মাদারীপুর হইতে যে ষ্টীমার খুল্‌নায় যায়, সেই ষ্টীমারে আমরা নড়াইল যাইবার জন্য বেলা প্রায় ২টার সময় উঠিলাম। ষ্টীমারে ২ঘণ্টা লাগিয়াছিল।

বঙ্কুদাদা, কালীবিশ্বাস দাদা, পাগল বরাবর খুলনা হইতে কলিকাতায় চলিয়া আসিবেন স্থির করিয়াছেন। আমারও যাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল। গোপালগঞ্জ থাকিতে ঠাকুর আমার ঐরূপ ইচ্ছা টের পাইয়া বসন্তকে বলিয়াছিলেন "জিতেন কেন যাইতে চায়? পয়সা তো কতই রোজগার করিয়াছে, কয়দিন না করিলে কি হয়? আমার সঙ্গে নড়াইল গেলে ভাল হয়" আমি উহা শুনিয়া নড়াইল যাওয়াই স্থির করিলাম।

ঠাকুর ষ্টীমারে ফার্ষ্ট ক্লাশ ডেকে একখানি ইজি চেয়ারে বসিয়া আছেন। পাগল, আমি, বঙ্কুদাদা ও অন্যান্য অনেকে ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছি।

পাগল বলিল "আমি এখন কলিকাতা যাইতেছি। ২।৩ দিন পর সম্বলপুর যাইয়া ওকালতী করিব স্থির করিয়াছি। আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

ঠাকুর বলিলেন "আমি সকল সময়ই তোমাদের আশীর্ব্বাদ করি—সর্ব্বদা তোমাদের কল্যাণ কামনা ঠাকুরের নিকট করিয়া থাকি। বড়ই দুঃখের বিষয় তুমি কলিকাতায় থাকিতে পারিলে না।

হেমেন্দ্রবাবুর দেহত্যাগের পর পাগল দিন কতক আলিপুরে ওকালতী

করিয়া, সুবিধা হইতেছেনা দেখিয়া সম্বলপুরে তাহার এক আত্মীয়ের কাছে থাকিয়া ওকালতী করিবে স্থির করিয়াছে। ঠাকুর তাহাতে বিশেষ মতও দেন নাই, অমতও দেন নাই।

পাগল ঠাকুরের ঠিক মতটী জানিবার জন্য বলিল "আমার সম্বলপুর যাওয়া ভাল হইতেছে কি মন্দ হইতেছে বুঝিতেছিনা। আপনি অনুমতি দিলে নিশ্চিন্ত হইতে পারি"।

ঠাকুর বলিলেন "আমি কখনও কাহারও স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দিতে চাইনা। এই সকল সাংসারিক পরামর্শ আমার নিকট জিজ্ঞাসা না করাই ভাল। প্রাণের ভিতর হইতে যাহা আসে তাহাই করিয়া যাও। ভবিষ্যতে যাহা হইবার তাহা হইবেই। কেহই ঠেকাইতে পারিবে না। বিবাহ ইত্যাদি সাংসারিক বিষয়ে গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলে সম্বন্ধ অনেক সময় শিথিল হইয়া যায়। আমাদের একটী গুরু ভাইএর কন্যার এক জায়-গায় বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়। গোঁসাইকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি সেই স্থিরীকৃত সম্বন্ধ করিতে না বলিয়া অন্য আর একটী পাত্রের সহিত বিবাহ দিতে—যেমন ভবিষ্যৎ চিত্রে দেখিয়াছিলেন—সেইরূপ বলিলেন। গোঁসাইর কথায় মেয়েটীর সেইখানেই বিবাহ হয়, কিন্তু অল্পদিন পরেই কন্যাটী বিধবা হয়। তাহাতে তাঁহাদের গোঁসাইর উপর বিরূপভাব হইয়াছিল। যাহা ভবিতব্য তাহাই চিত্রে দেখিয়া গোঁসাই বলিয়াছিলেন। মেয়েটীর বৈধব্য যোগই গোঁসাই দেখিয়াছিলেন—ভবিতব্য কেহই খণ্ডন করিতে পারে না। ভগবানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যাহা ঠিক মন হইতে আসে তাহাই করিয়া যাও। যাহা ভবিতব্য তাহা হইবেই—"

এই কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে, ষ্টীমার সন্ধ্যার সময় বড়াদিয়া আসিল। সেখান হইতে একখানি মোটর লঞ্চে আমরা নড়াইল রওনা হইলাম এবং একটু রাত্রি থাকিতে নড়াইলে পৌছিলাম। বিধুবাবু উকীলের বাড়ীতে ঠাকুরকে লইয়া উঠিলাম। আমি ওখান হইতে কলিকাতা চলিয়া আসিলাম।

বাসগুা ও মোড়লগঞ্জ গমন

ঠাকুর নড়াইল হইতে বাসগুা হিরণের বাড়ীতে গেলেন। হিরণ এবারেও কৃতার্থ হইল এবং গুরু ভাইদের খুব আদর যত্ন করিল। ঠাকুর বাসগুা ২দিন থাকিয়া মোড়লগঞ্জে গুরুভাই শ্রীযুক্ত অম্বিকা রায়ের বাড়ীতে দুইদিন থাকিলেন। শুনিলাম অম্বিকা দাদা যেরূপ আদর যত্ন করিয়াছিলেন তাহার তুলনা নাই। কলিকাতা হইতে রসগোল্লা, সন্দেশ, নানা প্রকার ফল, বরফ ইত্যাদি আনাইয়াছিলেন এবং একঘরে স্তূপাকৃতি ডাব রাখিয়াছিলেন। গুরুভ্রাতাগণ নাকি জলের বদলে ডাবই খাইতেন। সেখানে থাকিতেই গুরুভ্রাতা অন্নদা দাদার একটু একটু জ্বর হইতেছিল দেখিয়া, পরাণদাদা ও অচ্যুৎদাদা সকালবেলা তাঁহাকে লইয়া কলিকাতা আসিলেন। ঠাকুর এক রাত্রি খুলনায় ৺ললিত দত্ত চৌধুরী উকীলের বাড়ীতে থাকিয়া, পরদিন সন্ধ্যায় সময় কলিকাতা পৌছিলেন।



POPULAR PRESS CAL.

অন্নদাদাদার মৃত্যুতে ঠাকুরের কথা

৺অন্নদাচরণ দাস হেমেন্দ্রবাবুর প্রতিবেশী ছিল এবং তিনি তাহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। তাঁহারই চেষ্টায় অন্নদা দাদা লাভচাঁদ মতিচাঁদের কার্য্যে চাকুরী করিত। হেমেন্দ্রবাবু তাহাকে বাড়ীর ছেলের মতই ভাল বাসিতেন। প্রায় আড়াই বৎসর পূর্ব্বে সে ঠাকুরের নিকট দীক্ষা লইয়াছিল এবং দীক্ষার পর হইতে খুব আগ্রহ সহকারে সাধন ভজন করিত। ভবানীপুর অঞ্চলে একটী সাধন বৈঠক নাই বলিয়া সে ঠাকুরের নিকট অনুমতি লইয়া তাহার বাটীতে সাধন বৈঠক স্থাপিত করিয়াছিল। আমরা প্রতি শনিবার সেখানে যাইতাম। মোড়লগঞ্জ হইতে অন্নদা দাদা যে জ্বর লইয়া আসিল, তাহাই সান্নিপাতিক আকার ধারণ করিল এবং ১৩।১৪ দিন ভুগিয়া ২রা নভেম্বর সোমবার বেলা ১টার সময় তাহার দেহত্যাগ হইল। সেইদিন বিকাল বেলা ৬টার সময় আমরা সকলে মির্জাপুর ষ্ট্রীটে ডাক্তার সত্যরঞ্জন দাদার বাড়ীতে ঠাকুরের নিকট গেলাম। সকলেই অন্নদাদার মৃত্যুর বিষয় আলোচনা করিতেছি এবং দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। ঠাকুর ততক্ষণ তাঁহার ছোট ভাই শ্রীযুক্ত রোহিনীকাকার সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন। তিনি একটু পরে চলিয়া গেলেন, আমরা সকলে ঘরের ভিতর নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। কাহারও মুখে একটীও কথা নাই। সমস্ত ঘরটী যেন শোকাচ্ছন্ন হইয়া আছে। একটু পরে সেই নিস্তব্ধতা ভগ্ন করিয়া ঠাকুর বলিতে লাগিলেন ঃ—

"এই তো মানুষের সব—অন্নদা কোথায় চলিয়া গেল! তাহার সাজানো বাড়ী ঘর স্ত্রী, মাতা, প্রভৃতি সকলেই ঠিক যেমন ছিল তেমনই রহিয়াছে—যেখানকার জিনিষ ঠিক

সেইখানে আছে, আর সে কোথায় কোন অনন্তে মিশিয়া গিয়াছে! যেন এক খণ্ড প্রস্তরের কণা মহাসমুদ্রের বারি-রাশির মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে! কোথায় গিয়াছে তাহার ঠিক ঠিকানা নাই। আজ তো তাহার সুন্দর অট্টালিকা, বিষয় সম্পত্তি স্ত্রী, পুত্র, তাহার কোনও প্রয়োজনে লাগিল না। সমস্ত জীবনব্যাপী উন্মত্তের ন্যায় লোকে যে স্ত্রীপুত্র ভরণ-পোষণের জন্য অর্থ রোজগার করে—তাহার কিছুইতো তাহার নিজের প্রয়োজনের জন্য নয়! সমস্তই একটা বৃথা পরিশ্রম। নিজের বাস্তবিকও যাহা প্রয়োজন তাহা কয়জন করিয়া থাকে? সংসারে লোকে কেবল শঠতা, প্রবঞ্চনা, জাল, জুয়াচুরি করিয়া অর্থ রোজগারের জন্য চতুর্দ্দিকে ছট্‌ফট্‌ করিয়া বেড়ায় এবং সমস্ত রোজগার স্ত্রী পুত্রের পাদমূলে ঢালিয়া দেয় এবং তাহাদের মায়ায় আবদ্ধ হইয়া জীবন কাটাইয়া দেয়। স্ত্রী পুত্র তাহার কে? স্ত্রী পুত্র দ্বারা তাহার কোনও প্রয়োজন সাধিত হয় না। স্ত্রী পুত্র এই হিসাবে নরকের দ্বার। ধর্ম্ম জীবন লাভের বাস্তবিকও কণ্টক স্বরূপ। তাহাদের মায়া কাটাইতে না পারিলে, নিজের যথার্থ কল্যাণ কিছুতেই সাধন হয় না। এই জন্যই ভাগবতে কোনও স্থানে লেখা আছে যে যাহার কুপুত্র এবং ভার্য্যা দুশ্চারিণী, সে বড়ই ভাগ্যবান—কারণ তাহা হইলে স্ত্রী পুত্রের আচরণে বিরক্ত হইয়া তাহাদের মায়া সহজে কাটাইত পারে এবং বৈরাগ্য ভাব আসিতে পারে।

তোমরা স্ত্রী পুত্র বলিতে অস্থির হইয়া যাও। এই নশ্বর দেহ হইতে আত্মা ছাড়িয়া গেলে, স্ত্রী পুত্রের দ্বারা দৈহিক যে সুখ

হইত, তাহার বিন্দুমাত্রও স্মরণ থাকে না—সমস্তই বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া যায়। কারণ আত্মার তো দেহ নাই—দৈহিক সুখের কথা মনে থাকিবে কেন? কিন্তু স্ত্রী যদি প্রকৃত সহ-ধর্ম্মিণীও সহকর্ম্মিণী হয় তাহা হইলে দেহান্তরের পর শুধু তাহার সেই ধর্ম্ম কার্য্যের সহায়তার স্মৃতিটুকু—স্বপ্নে দেখার মত,—মাঝে মাঝে মনে হয়। আর কিছুই মনে থাকে না। স্বপ্নে যেমন ব্যাঘ্র দংশন করার, চর্ব্ব্যচোষ্য লেহ্য, পেয় আহার্য্যের স্বপ্ন অনুভূতি হয় এবং স্বপ্ন ভঙ্গে কেবল তাহার স্মৃতিটুকু থাকে, সেইরূপ। বাল্যকালে কোন বন্ধুর সঙ্গে বাল্য ক্রীড়ার কথা যেমন হঠাৎ সেই বন্ধুকে ২৫ বৎসর পরে দেখিলে স্মৃতিপথে জাগরূক হয়, সেইরূপ। কিন্তু এই যুগে স্ত্রী প্রকৃত সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী দেখা যায় না, এখন স্ত্রী কেবল বিলাসের সামগ্রী। দৈহিক সুখের উপকরণ যোগাইবার বস্তু। দেহের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সে সমস্ত সুখই একেবারে বিলীন হইয়া যায়। পরলোকের সঙ্গে ইহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ থাকে না। বাস্তবিক সহধর্ম্মিণী হইয়া যদি দুই জনেই একটী খুঁটার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জীবন যাপন করিতে পারে, তাহা হইলে পরলোকেও সেই খুঁটার দিকে অগ্রসর হইবার সময় পরস্পরের দেখা শুনা হয়। এবং ধর্ম্মের জন্য পরস্পর যতটুকু সাহায্য করিয়াছিল তাহাই স্মরণ পথে আসে, নতুবা কে কোথায় নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায় বিক্ষিপ্ত হইয়া যায় তাহার ঠিকানা থাকে না। সেই খুঁটার সঙ্গে সূক্ষ্ম তারের সংযোগ করিয়া সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্ম

না করিলে স্ত্রীর সঙ্গে আর কি সম্বন্ধ থাকে! তোমাদের কাহারও স্ত্রীর বা পুত্রের একটু অসুখ হইলে মুখখানা যেন একেবারে আম্‌সির মত হইয়া যায়। স্ত্রী পুত্র মরিয়া গেল তোর তাহাতে কি? কে স্ত্রী? কে পুত্র? তোমার কোন্ কার্য্যে তাহারা আসিবে? স্ত্রী মরিয়া গেলে তাহার বুকের উপর পড়িয়া কান্দিতে থাকে, তাহাতে কি ফল হয়?"

একটু থামিয়া ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন - "অন্নদা সাধন গ্রহণ করিয়াই এদিকটা এত দৃঢ়তার সহিত আক্‌ড়াইয়া ধরিয়াছিল, এবং এই দিকের সঙ্গে এমন গাঢ় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল, যে এত অল্প সময়ের মধ্যে এইরূপ কাহারও দেখা যায় না। মাত্র দুই কি আড়াই বৎসর তাহার সাধন হইয়াছিল। সাধনের দিন হইতেই তাহার এই দিকটা একেবারে খুলিয়া গিয়াছিল এবং শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহার সমুদয় কার্য্য ঠাকুরের জন্য নিয়োজিত করিয়াছিল। এই কয়দিন নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গ করিয়া চলিয়া গেল! আজ সে একেবারে নিরাপদ স্থানে গিয়া পৌঁছিয়াছে।

"একবার ভাবিয়া দেখ, তাহার পরিধানের বহু মূল্য বস্ত্রাদি, শয্যা, সংসারের সমুদয় প্রয়োজনীয় জিনিষ, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, সকলেই এখানে পড়িয়া রহিল, আর সে কোন অচেনা অজানা জায়গায় চলিয়া গিয়াছে!"

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন "তাহার মৃতদেহে কখন অগ্নি সংস্কার করা হইয়াছে?

বীরেশ্বরদাদা বলিল "১২-১৫ মিনিটের সময় দেহত্যাগ

হইয়াছে, ৩।।০টার সময় চিতা প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। আমি পতিতপাবন, চুণি, পরাণ শ্মশানে গিয়াছিলাম” ঠাকুর বলিলেন, “খুব ভাল হইয়াছে। সময় থাকিলে এদিক হইতে আরও যাওয়া উচিত ছিল”। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন ২।।০ ঘণ্টায় কয় দণ্ড হয়?

মহানন্দদাদা—“৬।০ দণ্ড”।

ঠাকুর। “৭।।০ দণ্ড, অর্থাৎ এক প্রহর পরে দেহে অগ্নি সংস্কার করা বিধি। কারণ মৃত্যুর অব্যবহিত পরে আত্মা দেহের অতি নিকট দিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। দেহের উপর ঐকান্তিক টান থাকিলে ঐ সময়ের মধ্যে আবার দেহে প্রবেশও করিতে পারে। এই জন্যই ঐ সময়টা দেখিয়া অগ্নি সংস্কার বিধি। অনেক সময়ে দেখা যায় শ্মশানে লইয়া যাওয়ার পরেও দেহে জীবন সঞ্চার হয় এবং শ্বাস প্রশ্বাস বহিতে থাকে এবং রোগী পুনর্জীবন লাভ করে। কিন্তু প্রায়ই আত্মা দেহ ছাড়িয়া গেলে ঐ জড়পিণ্ডধারী, অত্যন্ত ক্লেশদায়ক দেহ দেখিয়া, উহাকে নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখে; বিশেষতঃ পুত্র যখন মুখে আগুন দেয়, তখন দেহটীর উপর আরও ঘৃণা হয় বলিয়া, আর উহার মধ্যে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা হয় না। ঐ এক প্রহর আত্মা দেহের অতি সন্নিকটে থাকিয়া দেহের শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া উহাতে বীতরাগ হইয়া যায় এবং শান্তিময় স্থান খুঁজিতে থাকে; তখন পিতৃ পুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুনি ঋষিগণ তাহাকে পিতৃলোকে লইয়া গিয়া সাধন ভজন করাইতে থাকেন। ঐরূপ অবস্থায় আত্মা কিছুদিন

নিমগ্ন থাকিলে, পুত্র কন্যাগণের পিণ্ড ও শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ভোগ করিয়া তৃপ্তি লাভ করে। শ্রাদ্ধের অন্ন সম্ভার, দ্রব্য সামগ্রী ইত্যাদি সমুদয় আত্মা ভোগ করিয়া থাকে। আত্মার তো দেহ নাই, দৃষ্টি দ্বারাই ভোগ করিয়া তৃপ্তি লাভ করে। এইরূপ আত্মার তৃপ্তি হইলে পিতৃপুরুষের সঙ্গে ১ বৎসর কাল অবস্থিতি করে। মৃত্যুর পরেই যমলোকে যায় না। এই এক বৎসর প্রেত হইয়া থাকে: তৎপরে সপিণ্ডকরণ শেষ হইলে পিতৃপুরুষদের ছাড়িয়া বিচারের জন্য যমলোকে উপস্থিত হয়। সেখানে তাহার সমুদয় কর্ম্ম ফলের বিচার হয়। দেহে অবস্থানের সময় প্রতিদিন ও প্রতি মুহূর্ত্তে, যা কিছু শুভ অশুভ চিন্তা, বা কর্ম্ম করা যায়, প্রতি শ্বাস, প্রশ্বাস, ছোট বড় সমুদয় কর্ম্মের একটা ফলক ললাটে আঁকা হইয়া যায়—তাহার কিছুই নষ্ট হয় না। যেমন কথা বলা হইয়া গেলেই বা একটী গান করা হইলেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার শেষ হয় না—Atmosphereএর মধ্যে উহার প্রতি Vibrationএর বিন্দু রহিয়া যায় এবং Gramophone আদি যন্ত্রের সাহায্যে তাহাকে অবিকল ধরিয়া রাখা যায়—ঠিক যেমন ভাবে কথা বলা হইয়াছিল, যেমন ভাবে গান করা হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সুর তান লয় Gramophone দ্বারা আবদ্ধ রাখিয়া record প্রস্তুত হয়, সেইরূপ প্রত্যেক মানুষের প্রত্যেক কর্ম্মফল ললাটের উপর আঁকিয়া সেই record লইয়া যমলোকে বিচারের জন্য যাইতে হয়; ললাটের ঐ কর্ম্ম ফলক অথবা record দৃষ্টে তাহার বিচার হয়। বিচার হইয়া গেলে কর্ম্মফল অনুযায়ী

আবার পুনর্জ্জন্ম হয়। যাহার যেরূপ কর্ম্ম তাহার সেইরূপ জন্ম হয়।"

বগলা—"বিচারের সঙ্গে সঙ্গেই কি পুনর্জন্ম হইয়া থাকে" ?

ঠাকুর—"না. সকলের পক্ষে তাহা হয় না। সৌভাগ্যবান্ পুরুষ "তৃণ জলৌকা"বৎ অর্থাৎ ছিনা জোঁকের ন্যায় তখনই জন্ম লয়—যেমন ছিনা জোঁক এক দিকের অবলম্বন অন্য আর একটা দিকের অবলম্বন না পাওয়া পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দেয় না, সেই-রূপ বিশেষ সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তির ঐ দিকের অবলম্বন ছাড়িয়া দিবা মাত্রই আবার জন্ম হয়। নতুবা কতকাল যে পরলোকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। কেহ হয়তো বয়েল হইয়া জন্মাইয়া কলিকাতার রাস্তায় গাড়ী টানে, কেহ বা ধনী কিংবা রাজপুত্র হইয়া জন্মায়।

বগলা—'নরক ভোগ কি এই পৃথিবীতেই হইয়া থাকে না যমলোকে হয়'?

ঠাকুর—"না পরে, এখানে আর কি হয় ? যমলোকে বিচারের পর স্বর্গ বা নরক ভোগ হয়। ঋষিরা স্বর্গ ও নরকের যে সমুদয় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সকল বর্ণে বর্ণে সত্য, কিছুই মিথ্যা নহে, অতি রঞ্জিত বা কল্পিত নহে। তাঁহারা মিছামিছি কল্পনা করিতে যাইবেন কেন ? তাঁহাদের তাহাতে স্বার্থ কি ?" একটু থামিয়া ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন—

"সদ্‌গতি লাভ করিতে হইলে গীতায় যেরূপ আছে সেই ভাবে হওয়া চাই"—

ওঁ মিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরণ্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥

ভগবানের সঙ্গে একেবারে সম্বন্ধ স্থাপন করা চাই—শুধু ইষ্ট নাম জপ করিলেও হইবে না। "ওঁ ব্রহ্ম "শব্দের অর্থ যাহার" যে ইষ্ট নাম। ইন্দ্রিয় দ্বার সংযত, হৃদয় কমল নিরুদ্ধ ও ভ্রূমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া, ওঁ এই একাক্ষর উচ্চারণ করিলেই কেবল হইবে না। "মামনুস্মরণ" হওয়া চাই, অর্থাৎ তাঁহাকে স্মরণ করা চাই। সম্বন্ধ স্থাপন না হইলে যথার্থ স্মরণ হয় না। "ইষ্ট নাম জপ কর এবং আমাকে স্মরণ কর" শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন। যে ইষ্ট নামের এত ফল তাহাও ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ না হইলে বিফল হইয়া যায়। এই সম্বন্ধ জীবদ্দশায় করিতে পারিলেই এবং জীবদ্দশায় প্রতি কার্য্যে প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহাকে স্মরণ করিলে মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহাকে স্মরণ হয়। মৃত্যুর তো আর অবধারিত কাল নাই। ভগবদুদ্দেশ্য ব্যতিরেকে আর কোন কার্য্যই সফল হয় না। দেহত্যাগ সময়ে তাঁহার স্মরণ হইলেই সদ্‌গতি হয়—নতুবা শুধু নাম জপেও ফল হয় না।

ভগবৎ সম্বন্ধ স্থাপন করাই যখন মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন সমুদয় কার্য্যই ভগবদুদ্দেশ্যে করিতে হয়। কার্য্য সকল বিশৃঙ্খলা ভাবে না করিয়া ভগবানের সঙ্গে যোগ রাখিয়া করিতে হয়—সরু তারে বাঁধিয়া রাখিবার মত।

তোমাদের ২৪ ঘণ্টার পরিশ্রমের ফলের সমুদয় কার্য্যই সংসারের জন্য ন্যস্ত করিয়া থাক। স্ত্রী পুত্র পরিবার প্রতি-

পালনের জন্য যে ব্যয়, তাহাই কেবল সার্থক মনে কর। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একটী ঘণ্টার পরিশ্রমের ফলও ভগবদুদ্দেশ্যে ব্যয় করিলে তাহা নিতান্ত বাজে ব্যয় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রতিদিন অন্ততঃ এক ঘণ্টার ফলও ভগবদুদ্দেশ্যে ব্যয় করিলে একটা সম্বন্ধ স্থাপন হয়—তাহা কয় জন করে? প্রতিদিন গরীব দুঃখীকে একটী, দুইটী কি চারিটী পয়সা দিলে কিছুই আসিয়া যায় না। সাধনের সময়কার একটী উপদেশও পালন করা হয়। তাহাই বা কয়জন করে? প্রতিদিন কিছু দয়ার কার্য্য ভগবদুদ্দেশ্যে কয়জন করিয়া থাকে? কিছু দয়ার কার্য্য, অন্ততঃ একটী পয়সা দান না করিলে যে সেই দিনটী বৃথা যায়—সম্বন্ধ স্থাপন হইবে কি প্রকারে? সংসারের জন্য, স্ত্রী পুত্রের সুখের জন্য, কত সময় কত পয়সা অনর্থক ব্যয় হয়, তাহা মনে হয় না। ভগবদুদ্দেশ্যে একটী পয়সা ব্যয় করিবার সময় যত বিচার বুদ্ধি আসে। Calculation করিয়া কার্য্য করিতে গেলে তাহা আর হয় না। ভাল কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি যখন আসিবে, তখনই উহা করিয়া ফেলিতে হয়। তখন অর্থের অভাবের কথা ভাবিতে গিয়া calculation করিতে গেলে সেই শুভ মুহূর্ত্ত হারাইতে হয়। বিনা বিচারে উহা তখনই করিয়া ফেলিতে হয়—শেষে যাহা হয় হইবে। আমাদের একটী গুরু ভাই ৮৷১০ হাজার টাকার দেনার দায়ে একেবারে জর্জ্জরিত হইয়া দিনপাত করিতেছিলেন। গোঁসাই যখন পুরীতে অনেক টাকা দেনা করিয়া, সমুদয় দান করিয়া ফেলিলেন, তখন তাঁহাকে দেনার দায় হইতে মুক্তি দিবার

জন্য চতুর্দ্দিকে চিঠি লেখা হইল। গুরু ভাইটী তাহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ৩০০০৲ টাকা পাঠাইতে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার স্ত্রী পুত্র যথেষ্ট বাধা দিল, কিন্তু তিনি কিছুতেই শুনিলেন না। বলিলেন, এত কালতো নিজের বোঝা বহিয়া গেলাম। গুরুদেবের যদি সামান্য একটু বোঝাও লাঘব করিতে পারি, তাহা হইলে জীবন সার্থক হইবে। এই বলিয়া তিনি কোন বাধা না মানিয়া ৩০০০৲ টাকা দিয়া দিলেন। শেষে তাঁহার সমস্ত দেনা শোধ হইয়া গেল। কেহ কেহ নিজে না খাইয়াও অর্থ সঞ্চয় করিয়া সুখ পায়। আমার এত অর্থ আছে, কেবল ইহা ভাবিতেই সুখ। অর্থের অভাব থাকিলেও যে ভাল কার্য্য করা যায় না তাহাও ঠিক নহে—জীবন ধারণের জন্য অর্থের অভাব হয় না। ভোগ বিলাসের অভাবই অভাব মনে হয়। গয়ার পাহাড়ে একদিন একজন বড় লোক গয়াল একটী বড় সাধুর নিকট আসিয়া কাঁদিয়া বলিল—

"মহারাজ, হামারা সর্ব্বনাশ হুয়া—হামারা সব তালুক মুলুক নিলাম হো গিয়া—হাম্‌কো কুচ্‌ নেই হ্যায়—হাম আভি কেয়া করেগা" এই বলিয়া আছড়াইয়া কান্দিতে লাগিল। সাধুটী তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"হাঁ, এই ছা হাল কব্‌ হুয়া ?

গ। আজ ছেমাহিনাছে এইছা হাল হুয়া।

সা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোম্‌কো তব্‌তো বহুত কষ্ট হুয়া—আচ্ছা, আজ কেয়া খায়া ?

গ। ডাল রুটী তরকারী—

সা। আচ্ছা, কাল কেয়া খায়া?

গ। কাল ভি এ্যয়ছা ডাল রুটী খায়া।

সা। হরবকত ছেমাহিয়ানা এ্যয়ছা ডালরুটী মিলাথা?

গ। হ্যাঁ—

সা। তব্ তোম্‌কা ক্যায়া হুয়া? খানা তো মিল্ যাতা হ্যায়। আউর ক্যায়া মাঙ্গতা হ্যায়।

ধর্ম্ম জীবন যাপনের পক্ষে বেশী অর্থ থাকা একটী বিশেষ অন্তরায়। কোনও প্রকারে দিনপাত হইবার উপযোগী অর্থ থাকিলেই যথেষ্ট। একবার অর্থে স্পৃহা জন্মিলে তাহার আর শেষ নাই। শত টাকা হইলে সহস্র চায়—সহস্র হইলে লক্ষ চায়—"লক্ষাধিপস্তথারাজ্যং"। আকাঙ্ক্ষার কিছুতেই নিবৃত্তি হয় না। দিবারাত্রি জাল, জুয়াচুরী করিয়া অর্থ সঞ্চয়ের জন্য বিপুল পরিশ্রম করে, কিন্তু কিছুতেই তাহার শান্তি হয় না। সাধুরা যে বলেন কামিনী কাঞ্চন উভয়ই ত্যাগ করা দরকার, তাহা একেবারে ঠিক। কামিনা কাঞ্চনে স্পৃহা থাকিতে কিছুতেই ধর্ম্ম লাভ হয় না। কামিনীর স্পৃহা অপেক্ষা কাঞ্চনের স্পৃহাও কম ক্ষতিজনক নয়। একবার গোঁসাইকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল কামিনীর স্পৃহা বেশী অনিষ্টজনক, না কাঞ্চনের স্পৃহা? গোঁসাই বলিলেন—"কাঞ্চনের স্পৃহা, কারণ কামিনীর স্পৃহা ভোগ করিতে করিতে শান্তি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু কাঞ্চনের স্পৃহার কিছুতেই শান্তি হয় না।"

একটু থামিয়া ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন।

"অন্নদার ভগবদুদ্দেশ্যে খরচের তুলনা নাই। ধার করিয়া পর্য্যন্ত এই জন্য অকুণ্ঠিতভাবে খরচ করিত। কাহার কি অভাব আছে বুঝিয়া তাহা পূরণ করিত। দান, পরোপকার ইত্যাদি নীরবে করিয়া যাইত—কাহাকেও জানিতে দিত না। আমাকে কখনও কোন জিনিষ দিতে আসিলে, দেখিতাম তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে—সর্ব্বদাই ভয় হইত পাছে আমি গ্রহণ না করি, গ্রহণ করিলেই কি আনন্দ হইত! শুধু গ্রহণেই তাহার আনন্দ হইত। ইহাই তো চাই। এই যে তাহার বাড়ীতে বৈঠক হইত, তাহাতে প্রাণ ঢালিয়া দিয়া খরচ করিত। সাধন নেওয়ার পর হইতে সমান ভাবে ভগবদুদ্দেশ্যে খরচ করিয়াছে। অন্য কোনও দিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। বোধ হয় কিছু ধারও আছে। অনেকবার আমাকে বলিয়াছিল চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে। আমি কত বলিয়া সেই সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিয়াছি।

আমি বলিলাম—"বেচারার বৃদ্ধা মা এখনও আছে"। তাঁহার কষ্টের সীমা নাই।"

ঠাকুর বলিলেন "তাহার আর কি হইবে। যমের সঙ্গে তো কোন চুক্তি নাই যে মা আগে যাইবে ছেলে পরে যাইবে। স্ত্রী, পুত্র, মাতা কেহই কিছু নয়। নিজের কার্য্যই করিয়া যাইতে হয়। সাধন নিলেই তো হয় না। সাধনের কার্য্য করিতে হয়, তাহা না হইলে কিছুই হয় না। তোমাদের স্ত্রী পুত্রের একটু অসুখ হইলে মুখ যেন একেবারে আমসীর মত হইয়া যায়। স্ত্রী পুত্র মরিয়া গেল তোমার তাহাতে

কি? কে স্ত্রী? কে পুত্র? তোমার কোনও কার্য্যে তাহারা আসিবে না।"

ঠাকুর চুপ করিলেন, রাত্রি প্রায় ১০টা হইয়া গেল এখনও ঠাকুরের রান্না হয় নাই। আমরা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। ঠাকুরের কথাগুলি কানে বাজিতে লাগিল। তখনই কলম লইয়া রাত্রি ৩টা পর্য্যন্ত ঐ কথাগুলি লিখিয়া রাখিলাম।

বৈঠকের নূতন প্রণালী

১৯২৫ সাল ২রা নভেম্বর অন্নদা মারা গিয়াছিল। তাহার পর ঠাকুর কিছুদিন জিতুদার বাড়ীতে ছিলেন। শুনিলাম বৈঠকে সকলের যোগদান সম্বন্ধে, ঠাকুর বড়ই পীড়াপীড়ি করিতেছেন। যদি কেহ বৈঠকে না যায় তবে তাহাকে দুই আনা জরিমানা দিতে হইবে, এই নিয়ম করিলেন। ১৬ই নভেম্বর জিতুদার বাড়ীতে বৈঠকের বন্দোবস্ত হইল। ঠাকুর নিজে আমাদের সঙ্গে বসিলেন এবং বৈঠকের নূতন প্রণালী দেখাইয়া দিলেন। পূর্ব্বে ছিল ৪৫ মিনিট প্রাণায়াম ও ১৫ মিনিট নাম। এখন বলিলেন—প্রথমে ৫ মিনিট নাম, তারপর ২০ মিনিট সহজ প্রাণায়াম, তারপর ৫ মিনিট নাম, তারপর ১৫ মিনিট অদ্ধ কুম্ভক যোগে প্রাণায়াম, তারপর ৫ মিনিট নাম, তারপর ৫ মিনিট পূর্ণ কুম্ভক যোগে প্রাণায়াম, সর্ব্বশেষে ৫ মিনিট নাম।

ঠাকুর এই প্রণালী দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন "একেবারে স্থির

হইয়া আসনে বসিয়া নাম করিতে হইবে। এই সময় হাত পা বা শরীরের কোন অঙ্গ নড়িবে না। শরীর নড়িলে মনঃ-সংযোগ হইবে না। যেমন খুব বড় পুষ্করিণী যখন স্থিরভাবে থাকে, তখন তাহাতে সামান্য একটা ঢিল ফেলিলেও সমস্ত জল আলোড়িত হয়, তেমনি স্থির হইয়া আসনে বসিলে শরীরের বায়ু সাম্য অবস্থায় থাকে, একটু নড়া চড়া করিলেই বায়ু বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়—মনঃ সংযোগ হয় না।"

একটী গুরু ভ্রাতার নাম করিতে করিতে শরীরের কম্পন হইতেছিল। ঠাকুর তাহাকে ধমক দিয়া উঠিলেন। তাহাতে সে বলিল যে কিছুতেই কম্পন রোধ করিতে পারিতেছে না। ঠাকুর বলিলেন "উহা এক প্রকার ব্যাধি ইচ্ছা করিলেই থামাইতে পারিবে।"

ভবানীপুরের বৈঠক

অন্নদা দার মৃত্যুর পর ভবানীপুরের বৈঠকটী আমার বাড়ীতে আনিবার জন্য আমার খুব ইচ্ছা হইল। পরাণ দাদা ও চুনী দাদার সঙ্গে পরামর্শ করিলাম। তাঁহারাও ইহাতে খুব আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কিছুদিন পরে ঠাকুর পুরী চলিয়া গেলেন। ঠাকুরের নিকট বৈঠক সম্বন্ধে একখানা চিঠি লিখিলাম তিনি অনুমতি দিয়া এই চিঠিখানা লিখিলেন।

স্নেহের জিতেন,

তোমার সৎ-সঙ্কল্পের আমি উৎসাহই দিতেছি। ঐরূপ একটি বৈঠক ভবানিপুর অঞ্চলে থাকা অত্যন্ত আবশ্যক।

৫ই ডিসেম্বর শনিবার তারিখে আমার বাড়ীতে প্রথম বৈঠক হইল। কলিকাতার প্রায় সকল গুরু ভ্রাতাগণ আসিয়া যোগ দান করিলেন। সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত, ঠিক নিয়মিত ভাবে প্রতি শনিবার আমার বাড়ীতে বৈঠক হইয়া থাকে। ভবানীপুরের গুরু ভাইরা যোগদান করেন এবং মধ্যে মধ্যে কলিকাতার গুরু ভাইরাও আসিয়া থাকেন। ইহাতে গুরু ভাইদের সঙ্গে একটা বিশেষ যোগ হয়। ভবানীপুরের চুনী দাদার সঙ্গে বৈঠকের পর হইতে বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছি। তাঁহাঁদের ফুলের বাগান আছে এবং মধ্যে মধ্যে তিনি ঠাকুরকে ফুল দিয়া এমন সুন্দর করিয়া সাজাইয়া দেন, যে দেখিয়া আর চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা করে না। আমাদের উপর তাঁহার স্নেহের সীমা নাই এবং আমাকে ঠিক কনিষ্ঠ সহোদর জ্ঞান করেন।

১৯২৬ সাল ঠাকুরের শিলং গমন।

এই বৎসর ঠাকুরের শরীর আবার খারাপ হইয়া পড়িল। মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত পুরীতে থাকিয়া শিলং হাওয়া পরিবর্ত্তন করিতে যাওয়ার জন্য কলিকাতায় আসিলেন। এবং জিতুদাদার বাড়ীতে কিছুদিন থাকিয়া জিতুদা, মহানন্দ দাদা প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া শিলং গেলেন। দুই মাস পরে বেশ সুস্থ হইয়া ২২শে মে তারিখে কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়া অল্প কিছুদিন থাকিয়া আবার পুরী চলিয়া গেলেন।

চাকুরী ও সাধনের বাহিরে নয়—বাজে কাজ নয়

১৮ই জুলাই ঠাকুর কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন। আমি বিকাল বেলা ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিতে গেলে, গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত বগলাপদ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হইল। দেখা হইতেই তিনি আমাকে বলিলেন।

"আজ ঠাকুর আমাকে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলিয়াছেন। প্রথমেই আমাকে স্মৃতিশাস্ত্র পড়িতে আদেশ দিয়াছেন এবং বলিলেন যে প্রাতঃকাল হইতে শয়ন কাল পর্য্যন্ত আমরা যে যে কার্য্য করি, তাহার সমুদয় গুলি শাস্ত্রের নির্দ্দেশ মত করিতে হয়। স্মৃতি শাস্ত্রে ঐ সকল আছে। প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিয়া শৌচের বিধি, দন্ত ধাবন, স্নান আহ্নিক, ভোজন, সাংসারিক কার্য্য, ব্যায়াম, ভ্রমণ, বিহার ইত্যাদি সমুদয় কার্য্য শাস্ত্র শাসন জ্ঞানে করিতে হয়। এমন কি তোমরা যে যে চাকুরী করিতেছ তাহাও সাধনের বহির্ভূত নয়—বাজে কাজ নয়। ইহা বলিয়া এই শ্লোকটী বলিলেন।

যৎ করোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্বমদর্পণম॥

১৯২৬ সালের মহাহোম।

এই বৎসর পূজার অল্প পূর্ব্বে ৩রা অক্টোবর তারিখে মাতৃদেবীর মৃত্যু হওয়ায় পূজার সময় বাড়ী যাইতে পারিলাম না। অশৌচ অবস্থায় ঠাকুরের সঙ্গে চন্দননগরে গিয়া দেখা করিলাম এবং মহাহোমের দিন সেখানেই থাকিলাম। বিজয়া দশমীর দিন সকলে ঠাকুরকে প্রণাম করিতে গেলাম। ঠাকুর সকলের কপালে চন্দন ও হাতে মহাপ্রসাদ দিলেন। ৺লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিন আমাদের নিয়ম ভঙ্গ—ঠাকুরের সম্মতিক্রমে সেইদিন গুরু ভ্রাতারা আমার বাড়ীতে উৎসব করিলেন এবং বিজয় বিশ্বাস দাদা মধুর কীর্ত্তন করিলেন।

১৯২৭ সাল ঠাকুরের জন্মোৎসব।

গত মহাহোমের পর ঠাকুর কলিকাতায় শ্রীযুক্ত আশু পালের বাড়ীতে আসিলেন এবং ১৮ই নভেম্বর ২রা অগ্রহায়ণ বৈকুণ্ঠ চতুর্দ্দশীর দিন আশু দাদার বাড়ীতে ঠাকুরের জন্মোৎসব হইল। প্রতি বৎসরই এই জন্মোৎসব হইতেছে। ঠাকুরকে সম্মুখে রাখিয়া বিজয়দাদা "রূপ" কীর্ত্তন করিলেন। ঠাকুর নিবিষ্টচিত্তে কীর্ত্তন শুনিলেন। তাহার পর ঠাকুরকে ফুল দিয়া সুন্দর করিয়া সাজান হইল। তাহাতে ঠাকুরের অপূর্ব্ব শোভা হইল। তখন একে একে সকল গুরু ভ্রাতারা ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ দিলেন। ঠাকুর কপালে চন্দন ও হাতে মহাপ্রসাদ দিলেন। কিছুদিন পর পুরী চলিয়া গেলেন।

১৯২৭ সালে দোলের উৎসব।

এই বৎসরের প্রথম হইতে ঠাকুর পুরীতে ছিলেন। ১৬ই মার্চ্চ তারিখ পুরী হইতে কলিকাতা আসিলেন। শুনিলাম ধনী গুরু ভ্রাতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাল মহাশয় দোলের উৎসব করিবার জন্য ঠাকুরকে আনিতে জিতুদাদাকে সঙ্গে লইয়া পুরী গিয়াছিলেন। ১৮ই মার্চ্চ মহা-সমারোহে দোলের উৎসব হইয়া গেল। জিতুদার তেতালার ছাদ সমস্ত ঘিরিয়া ফেলিয়া সন্ধ্যার পর প্রায় ৫০০ শত গুরু ভ্রাতা সমবেত হইল। সকলেই আবির মাখিয়া লাল হইয়া গিয়াছে। যতীন পাল দাদা সকলের সঙ্গে খুব আনন্দ করিতে লাগিলেন। বিজয়দা দোলের কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। ঠাকুর প্রথমে খুব নিবিষ্ট চিত্তে শুনিতে লাগিলেন। শেষে এক একবার আসন হইতে উঠিয়া আসিয়া সকলের গায় আবির ছড়াইয়া দিতে লাগিলেন এবং চক্ষু বুজিয়া "হরিবোল" "হরিবোল" বলিতে লাগিলেন। সেই দৃশ্য বড়ই চমৎকার। কীর্ত্তনান্তে প্রসাদ পাইয়া বাড়ী চলিয়া আসিলাম।

বিশুদ্ধ জলের উপকারিতা।

২০শে মার্চ্চ বেলা ৩টার সময় জিতু দাদার তেতালার উপরকার ঘরে যাইয়া দেখি ঠাকুর গুরুভ্রাতা একজিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। আমিও গিয়া সেখানে বসিলাম। ক্ষিতীশ দাদা সংস্কৃত গ্রন্থাদি ও ভারতের প্রাচীন সভ্যতার সম্বন্ধে বলিতে বলিতে বলিলেন, তিনি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজে স্যানিটারী ইন্‌জিনিয়ারীং সম্বন্ধে লেক্‌চারার নিযুক্ত হইয়াছেন। ঐ জন্য পূর্ব্বকালে হিন্দুদের কিরূপ স্যানিটেসনএর বন্দোবস্ত ছিল, সেই বিষয়ে ছাত্রদের বক্তৃতা দিতেছেন এবং তাহারাও খুব আগ্রহ সহকারে ঐ সকল শুনিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে জল ও জলাশয়ের পবিত্রতা রক্ষা করিবার নানা প্রকার বন্দোবস্ত ছিল। এবং উহাই যে স্বাস্থ্য রক্ষার একমাত্র উপায়, তৎসম্বন্ধে বহু গ্রন্থে, বহুভাবে লেখা আছে। এখনকার জলের কল যেরূপ cumbrons (জটীল) ভাবে করা হয়, তখন ঐরূপ করার দরকার ছিল না। অথচ অতি সহজ ভাবে জলের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা হইত।

ঠাকুর ইহা শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন—

"এই জন্যই অর্থাৎ স্বাস্থ্যের জন্যই "জলচল" বলিয়া একটা কথা আছে। জল শুদ্ধ না হইলে শরীর সুস্থ থাকিতে পারে না। জলের সম্বন্ধে শাস্ত্রের এই সকল সুন্দর সুন্দর কথা যে তুমি অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছ, ইহা বড়ই ভাল কথা। আমাদের দেশে কি না ছিল—অতি সহজভাবে সকল জিনিষই ছিল—এবং এমন সুন্দর নিয়ম কানুন ছিল, যে সেই সব পালন করিলে আর সহজে ব্যারাম পীড়া হইতে পারে না। আমাদের দেশে যাহা ছিল, তাহা পাশ্চাত্যেরা কল্পনাও করিতে

পারে না। ধর, এই যে একাগ্রতা সাধন শিখাইবার জন্য দ্রোণাচার্য্য যখন সকলকে, বৃক্ষোপরি মৎস্যের চক্ষুকে বিদ্ধ করিতে বলিলেন, তখন এক এক করিয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন কে কি দেখিতেছে। সকলেই পক্ষীর এক এক অংশের কথা বলিলেন, শেষে অর্জ্জুন যখন বলিলেন যে তিনি পক্ষীর কেবলমাত্র চক্ষুটী দেখিতেছেন, তখন দ্রোণাচার্য্য বলিলেন ইহাই প্রকৃত একাগ্রতা। এইরূপ একাগ্রতা সাধন কি আর কখনও কেহ কোন দেশে শুনিয়াছে? গোঁসাই এর মুখে শুনিয়াছি, যখন তিনি স্থির হইয়া নাম করিতে বসিতেন, তখন শরীরের ভিতর শিরায় শিরায় রক্তের চলাচলের কল্‌কল্‌ শব্দ পর্য্যন্ত শুনিতে পাইতেন। আমি অবশ্য অতদূর বলিতে পারি না, তবে স্থির হইয়া বসিলে শরীরের ভিতরকার বায়ু ঝড়ের মত বহিতে থাকে, এই বিষয় আমি সাক্ষ্য দিতে পারি। তখন এমন অসোয়াস্তি বোধ হয়, যে কুম্ভক না করিয়া থাকা যায় না। এইরূপ একাগ্রতা সাধনে দৃষ্টিশক্তিও অনেক পরিষ্কার হয়। একদিন গোঁসাই কি পড়িবার জন্য চস্‌মা চাহিলেন। তখন আমি বলিলাম 'আপনার চস্‌মার দরকার হয়'? তাহাতে গোঁসাই বলিলেন 'চস্‌মা একটা রাখিতে হয় বলিয়া কাছে রাখি, নতুবা (বহুদূরে একটী নারিকেল গাছ দেখাইয়া বলিলেন) ঐ গাছে পিঁপড়ার সারি আমি দেখিতে পাইতেছি, এবং ঐ পিঁপড়ার মুখে যে সাদা সাদা চিনি আছে তাহাও আমি দেখিতেছি—

এইরূপে আরও কথাবার্ত্তা হইল।

ঠাকুরের নাসিক দ্বারকা প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ

২২শে মার্চ্চ বিকালবেলা দেখা করিতে যাইয়া শুনিলাম আগামী কল্য ঠাকুর নাসিক, দ্বারকা ইত্যাদি তীর্থ ভ্রমণ করিতে বাহির হইবেন। প্রথমে শুনিয়াছিলাম ঠাকুর এবার হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় যাইবেন, কিন্তু ভাল বাড়ী না পাওয়া যাওয়াতে, সেই সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছেন এবং নাসিক যাওয়া স্থির করিয়াছেন। যতীন পাল দাদা তাঁহার জন্য সকল উদ্যোগ করিতেছেন। কেহ কেহ ভয় দেখাইয়াছিল যে সেখানে বড় গরম। কিন্তু হরিশদার ছোটভাই ক্ষিতীশ সেন, (বম্বে সিভিলিয়ান) বহুদিন নাসিকের জজ ছিলেন এবং ছুটী লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। তাঁহাকে হরিশদা আজ সকালে ঠাকুরের কাছে লইয়া আসিয়াছিলেন এবং তিনি ঠাকুরকে নাসিক যাওয়ার উৎসাহ দিয়াছেন, সেই জন্য নাসিক যাওয়া স্থির হইয়াছে। সন্ধ্যার পর আমরা সকলে জিতুদার দোতালার বারাণ্ডায় বসিয়া আছি, ঠাকুরও সেখানে আসিলেন, এবং অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর তিনি বলিলেন, "আমাদের কল্য নাসিক যাওয়াই স্থির হইয়াছে। ক্ষিতীশের সঙ্গে দেখা হইয়াছে—সে বলিল, নাসিক যদিও খুবই গরম, এমন কি প্রস্রাব করিলে তখনই তাহা শুকাইয়া যায়, তবুও সেখানে একটা Valley (উপত্যকা) আছে—উহা বেশ ঠাণ্ডা। কুম্ভমেলায় যাওয়ারও যোগাড় হইয়াছিল, কিন্তু এত ভিড় যে ভাল বাড়ীই পাওয়া যাইতেছেনা। বিশেষতঃ প্রকৃত সাধুদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা কম"।

শুনিলাম, ঠাকুর প্রথমে এলাহাবাদ যাইবেন। ঠাকুরের গুরু-ভ্রাতা এবং আমার বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ গুহ রায় মহাশয় তখন

এলাহাবাদে ছিলেন, আমি বলিলাম, "এলাহাবাদে হেমেন্দ্র গুহ রায় আছেন। তাঁহাকে একটা সংবাদ দিলে সব বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতে পারেন।

ঠাকুর বলিলেন, **"বন্দোবস্তের কোনও ত্রুটী হয় নাই, যতীন পাল সমস্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। সকল যায়গায় টেলিগ্রাফ ইত্যাদি হইয়া গিয়াছে। বোম্বাই প্রভৃতি স্থানেও সব ঠিক আছে। তবে হেমেন্দ্রের এলাহাবাদের ঠিকানাটা আমাকে দিও"।** আমি ঠিকানা বলিয়া দিলাম।

২৩শে মার্চ্চ ১৷৷০টার সময় ঠাকুর, যতীন পাল সস্ত্রীক, মহানন্দ দাদা সস্ত্রীক, আশুপাল সস্ত্রীক, কালীবিশ্বাস প্রভৃতি প্রায় ৩৬জন লোক সঙ্গে লইয়া হাওড়া হইতে রওনা হইলেন।

৮৷১০ দিন পরে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র গুহরায় এলাহাবাদ হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার নিকট শুনিলাম, এলাহাবাদে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়াছিল। সেখানে একটা প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালায় ছিলেন। হেমেন্দ্রবাবু বলিলেন, "এই গরমের মধ্যে এতগুলি লোক লইয়া তীর্থে বাহির হইয়াছেন"? তাহাতে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করায় ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন—

"তুমি তো জান, আমি আমার নিজের ইচ্ছায় কিছুই করি না।"

হেমেন্দ্রবাবু আরও বলিলেন, ঠাকুরের ওখান হইতে চিত্রকূট যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মহানন্দ দাদা প্রভৃতি অতগুলি লোক লইয়া পূর্ব্বে বন্দোবস্ত না করিয়া চিত্রকূট না যাওয়াই স্থির করিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া হেমেন্দ্র বাবু ঠাকুরকে বলিলেন—"আমি চিত্রকূট গিয়াছি। সেখানকার মন্দাকিনী গঙ্গা এবং হনুমান ধারা, শ্রীরামচন্দ্রের চিত্রকূট পাহাড়ের বাসস্থান ইত্যাদি এত সুন্দর যে বর্ণনা করা যায় না। এমন অপূর্ব্ব জায়গায় যাইবেন না? বলেন কি?"

ঠাকুর বলিলেন—

"আমার তো যাওয়ার খুব ইচ্ছা আছে, কিন্তু ছেলেরা বলে সেখানে থাকিবার ভাল জায়গা নাই—এতগুলি লোক লইয়া অসুবিধা হইবে।"

হেমেন্দ্রবাবু বলিলেন—

"সে কি? আপনিই তো বলিলেন নিজের ইচ্ছায় কিছুই করেন না। আপনার ভিতরে যিনি প্রবল ইচ্ছা দিয়াছেন, তিনিই সব ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।"

ঠাকুর বলিলেন—

"ঠিক্ বলেছিস্ তুই—আমি নিশ্চয়ই চিত্রকূট যাইব।"

ইহা বলিয়া মেঝেতে জোরে তিনটী চাপড় মারিলেন এবং তখনই সকলকে চিত্রকূট যাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন।

১৫ই এপ্রিল কালীবিশ্বাস দাদার বাড়ীতে গিয়া নাসিক হইতে তিনি তাহার ভাই বিজয় বিশ্বাস দাদাকে যে চিঠি দিয়াছেন, তাহা দেখিলাম। তাহাতে তাঁহারা চৈত্র সংক্রান্তির দিন ঠাকুরের সঙ্গে কিরূপভাবে গোদাবরীতে শ্রাদ্ধাদি করিয়াছেন এবং ফুল দিয়া ঠাকুরকে কিরূপ সুন্দর সাজাইয়াছিলেন এবং কিরূপ আনন্দে দিন কাটাইতেছেন ইত্যাদি লিখিয়াছেন। ২রা মে চুনীদাদা সংবাদ দিলেন ঠাকুর বৃন্দাবন হইতে রওনা হইয়াছেন, সেইদিনই রাত্রে কলিকাতা পৌছিবেন।

৩রা মে সকালবেলা খবর পাইলাম ঠাকুর কলিকাতা আসিয়া পৌছিয়াছেন। আমি কাছারী হইতে প্রায় ৩টার সময় মৃজ্জাপুর ষ্ট্রীটে জিতুদাদার বাড়ীতে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। আমার সঙ্গে ঠাকুরের গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত মাখনলাল গাঙ্গুলী মহাশয়ও গিয়াছিলেন। ঠাকুর তখন শৌচে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া মাখনবাবুকে আলিঙ্গন করিয়া

বসিলেন। খানিকক্ষণ উঁহাদের মধ্যে ঢাকার আশ্রম সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইল। শেষে মাখনবাবু জিজ্ঞসা করিলেন, "কেমন বেড়াইয়া আসিলেন এবং কেমন ছিলেন ?"

ঠাকুর বলিলেন "পথে কোন জায়গায় কোন কষ্ট হয় নাই বেশ ভালই ছিলাম। সকল রকমে সুবিধা হইয়াছিল। শেষে বৃন্দাবন আসিয়া শরীর বড় খারাপ হইয়াছে—সেখানে বড় গরম।"

একটু পরে আবার বলিতে লাগিলেন—

"এবার পুরীতে বড় ভালই ছিলাম। শিবরাত্রির সময় ভুবনেশ্বর আসিয়া উপবাস, রাত্রি জাগরণ ইত্যাদি করিয়া শরীর আবার বড় খারাপ হইয়া পড়িল। আবার পুরী ফিরিয়া আসিয়া মনে মনে ভাবিলাম, কয়েকদিনের জন্য কোথায়ও ঘুরিয়া আসি। ৫।৬ বৎসর যাবৎ আমার নাসিক যাওয়ার বড় ইচ্ছা হইয়াছে। আমি জিতুকে চিঠী লিখিলাম—আমার নাসিক যাওয়ার খুব ইচ্ছা। যদি যতীন পালের মত কোনও ধনী লোক ইচ্ছা করে—তাহা হইলে আমাকে নাসিক লইয়া যাইতে পারে। তাহার পরদিনই—সেই চিঠী পাওয়ার পূর্ব্বেই—জিতু ও যতীন পাল পুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। যতীনকে আমি কোন সংবাদ দেই নাই। শেষে শুনিলাম, সে নাকি আমাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিল,যেন আমি তাহাকে ডাকিতেছি। তারপর এখানে আসিয়া দোলের পর বাহির হইয়া পড়িলাম। আমার সঙ্গে ৩৬টী পুরুষ ও মেয়েমানুষ, শেষে প্রায় ৪২।৪৩জন হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পথে কোথায়ও

বিন্দুমাত্রও অসুবিধা হয় নাই। যতীন এমন সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছিল এবং এত অজস্র টাকা ব্যয় করিয়াছিল, যে যখন যেখানে গিয়াছি খুব আরামেই ছিলাম।

শ্রীযুক্ত মাখন গাঙ্গুলী জিজ্ঞাসা করিলেন—

"সর্ব্বাপেক্ষা কোন জায়গা ভাল বোধ হইল? ঠাকুর বলিলেন "চিত্রকূট ও মন্দাকিনী গঙ্গা এবং দ্বারকার গোপীতলা এই দুই জায়গা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে—দ্বারকার যে স্থানে গোপিকারা প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অস্থি মজ্জায়, ঐ স্থান হইয়াছে। ঐখানকার মাটী দ্বারা বৈষ্ণবরা তিলক করিয়া থাকেন। এমন সুন্দর স্থান যে দেখিলেই বসিয়া পড়িতে ইচ্ছা হয়।

মন্দাকিনীও অত্যন্ত সুন্দর লাগিল। চিত্রকূট পাহাড়ের চারিদিকে পাথরের বান্ধা রাস্তা—বহু মন্দির আছে—রাস্তার চারিদিকে মন্দির। যখন আরতি হয় তখন চারিদিক হইতে শঙ্খ, ঘণ্টার ধ্বনি উঠিতে থাকে। পাহাড়ে শ্রীরামচন্দ্রের পদচিহ্ন বর্ত্তমান আছে।

দ্বারকা নাথের মন্দির ও অতি পুরাতন এবং সুন্দর কারুকার্য্য-খচিত। যে সকল পাথরে তৈয়ারী তাহা এখন আর পাওয়া যায় না। প্রায় ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে তৈয়ারী বোধ হয়। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা এখন আর নাই—তাহা সমুদ্র গর্ভে বিলীন হইয়াছে। তাঁহার তিরোধানের পর এই মন্দির তৈয়ার হইয়াছে। দ্বারকানাথের মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের রাজ-মূর্ত্তি। এখানে বেশী মন্দির নাই। রুক্মিণীর মন্দির বড়,

আরও অন্যান্য মহিষীদের ছোট ছোট মন্দির আছে। এ-গুলিও যে বহুদিনের সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই দ্বারকা হইতে ষ্টীমারে চড়িয়া সমুদ্রের মধ্যে "বেট দ্বারকায়" যাইতে হয়। সেখানেও গিয়া এক রাত্রি বাস করিয়া আসিয়াছি। অনেক বৈষ্ণব বলেন যে "বেট দ্বারকাই" ধাম এবং দ্বারকা একটী তীর্থ মাত্র। "কাশীকাঞ্চি" এই শ্লোক অনুসারে উহাকেই বুঝা যায়। এইরূপ মতদ্বৈত আছে। একজন মহাপুরুষের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন দুই সমান এবং দুইটীই ধাম।

নাসিকও অতি সুন্দর স্থান। ওখান হইতে খানিক দূরে পাণ্ডব গুহা দেখিতে গিয়াছিলাম। পাহাড় কাটিয়া কি আশ্চর্য্য গুহা তৈয়ারী হইয়াছে! পাথরের উপর কারুকার্য্য খচিত প্রকাণ্ড তিনটী গুহা। তাহার এক একটীতে প্রায় ১০০০ লোক থাকিতে পারে। আরও অনেক গুহা আছে। কিন্তু এখন আর উহাতে একটী লোকও থাকেনা। কেবল গভর্ণ-মেণ্টের লোক পাহারা থাকে।

গৌতম মুনির আশ্রম দেখিতে গিয়াছিলাম। ত্রম্বকেশ্বর শিবের মাথা হইতে ঝর্‌নার দ্বারা গোদাবরী নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। গৌতম মুনি পাহাড়ের উপর তপস্যা করিতেন। তিনি কঠিন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেন এবং কখনও কাহারও প্রতিগ্রহ করিতেন না। নিজে জমী চাষ করিয়া, শস্য উৎপাদন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন এবং জলাশয়

খনন করিয়া পিপাসার নিবৃত্তি করিতেন। প্রবাদ এই যে, ইন্দ্র তাঁহার তপস্যায় ভীত হইয়া গোমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার শস্য নষ্ট করিতে লাগিলেন। গৌতম মুনি রাগান্বিত হইয়া একটা দর্ভ সেই গরুকে লক্ষ্য করিয়া মারিলেন। তাহাতে গরুটী মরিয়া গেল। তখন তিনি গোবধ-জনিত অপরাধের শাস্তি লইতে হইবে বলিয়া আকুল হইয়া শিবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তাহাতেই ত্রম্বকেশ্বর শিব সন্তুষ্ট হইয়া গঙ্গাকে মাথায় লইয়া আসিলেন। সেই ধারাতেই গোদাবরী হইয়াছে। গঙ্গা আর গোদাবরীতে কিছুই পার্থক্য নাই।

৫ই মে শ্রীযুক্ত কালীবিশ্বাস দাদার সঙ্গে মির্জাপুর ষ্ট্রীটে দেখা হইলে ভ্রমণের সম্বন্ধে বিস্তারিত বলিতে অনুরোধ করিলাম। কালীদা বলিতে লাগিলেন—

"প্রথমে আমরা এলাহাবাদ গিয়া পৌছিলাম। সেখানে ৩।৪ দিন ছিলাম—ত্রিবেনীতে স্নান ও তীর্থের কার্য্য ইত্যাদি, তীর্থ পাণ্ডার দ্বারা যথানিয়মে সম্পন্ন করা হইল। ঠাকুর এই বিষয়ে প্রত্যেক জায়গাতেই বিশেষ দৃষ্টি দিতেন এবং তীর্থের কার্য্য সম্বন্ধে যাহাতে কোনও ত্রুটী না হয় তাহা দেখিতেন। এলাহাবাদে মেয়েদের মধ্যেও অনেকে মস্তক মুণ্ডন করিয়াছিল। পাণ্ডাদিগকেও সকল জায়গায় মুক্তহস্তে দান করা হইত।

এলাহাবাদের পাণ্ডাকে লইয়া আমরা চিত্রকূটে রওনা হইলাম। ষ্টেশনে রাত্রি ১২টার সময় পৌছিলাম। রাত্রে ধর্ম্মশালায় যাওয়া অসুবিধা বলিয়া, সকলে রাত্রিটা প্লাটফর্ম্মেই কাটাইয়া দিলাম। মহানন্দের ক্যাম্প খাটে ঠাকুর প্লাটফর্ম্মে শুইয়া রহিলেন। মেয়েরা ওয়েটীং রুমের মধ্যে রহিল। আমরা যে যেখানে পারিলাম পড়িয়া রহিলাম। যতীন পাল বড়ই আমুদে—সমস্ত রাত্রি নানাপ্রকার গান গাহিয়া আমাদিগকে আনন্দ

দিতে লাগিল। ঠাকুর তাহা বেশ উপভোগ করিলেন। এখানে ঠাকুরের সহিত অবাধে মেলা-মেশার সুবিধা হইয়াছিল। ঠাকুরও যাহাতে আমাদের তামাক, চুরুট খাওয়ার অসুবিধা না হয় তাহা করিতেন—মহেন্দ্রের কাছে দেশালাই চাহিলাম—ঠাকুর শুনিতে পাইয়া নিজের পকেট হইতে দেশালাই বাহির করিয়া দিলেন—আমরা তো লজ্জায় মরিয়া গেলাম। এইরূপে ভোর হইলে আমরা সকলে ধর্ম্মশালায় গিয়া পৌঁছিলাম। এখানে ৪।৫ দিন ছিলাম। মন্দাকিনীতে স্নানাহ্নিক করিতাম। সকালে একটু জলযোগ করিয়া প্রায় ১০টার সময় মন্দির ও পাহাড় ইত্যাদি দেখিতে বাহির হইতাম। পাহাড়ের চারিদিকে বান্ধান রাস্তা আছে। তাহার ধারে ধারে সব দেবমন্দির আছে। ঐ দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে ঠাকুরকে অগ্রে করিয়া আমরা সকলে "জয় সীতারাম", "জয় সীতারাম" ধ্বনি করিতে করিতে পাহাড় অতিক্রম করিতে লাগিলাম—ক্লান্তি বোধ নাই। একটী স্থানে বিদ্যাপীঠের কতকগুলি ছাত্র, তাহাদের গুরুকে সঙ্গে করিয়া, ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া ঠাকুরকে ঘিরিয়া, সংস্কৃতে রামায়ণ গান গাহিতে লাগিল—ঠাকুর বলিলেন, "সমগ্র রামায়ণটী এই গানের ভিতর আছে।" এইরূপ যে যেখানে ঠাকুরের মূর্ত্তি দেখিতে পায়, অমনি বিস্মিত হইয়া চাহিয়া থাকে। কামপ্তা পাহাড়ে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে ভরতের দেখা হইয়াছিল সেই-খানে আসিয়াই ঠাকুর একেবারে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিলেন, **"এই সেই রামের পদচিহ্ন"** এবং সেইখানে ভাবে বিহ্বল হইয়া বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া বসিয়া পড়িলেন। আমরা তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলাম। কাহারও মুখে কোন কথা নাই—ঠাকুর মধ্যে মধ্যে বলিতেছেন, **"এই সেই পদচিহ্ন"**। মাথার উপর প্রখর রৌদ্র—কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে কাহারই তাহাতে কোন কষ্টবোধ নাই। এইরূপে প্রায় এক ঘণ্টা অতীত হইলে আমরা বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। ঠাকুরের তখনও সেই ভাব! তাহার পর আহারাদি ও বিশ্রামের পর ঠাকুর বিহ্বল অবস্থায় আমাদের একে

একে ডাকিয়া সকলকে আলিঙ্গন করিলেন। যতীন পাল ও মহানন্দের পিঠ থাব্ড়াইয়া জোরে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "তোমাদের জন্য আমি কৃতার্থ হইয়াছি—তোমাদের জন্য আমি এইখানে আসিতে পারিয়াছি। সকলে ভাল করিয়া দেখিয়া লও—এই তোমাদের পূর্ব্বপুরুষের স্থান। ঐ দেখ, শ্রীরাম তোমাদের দেখিতেছেন"! এইরূপে আমরা আলিঙ্গন মুক্ত হইয়া যে যেখানে পারি পড়িয়া রহিলাম। ঠাকুরের এইরূপ ভাব আর কখনও দেখি নাই। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! সন্ধ্যার সময় মন্দাকিনী গঙ্গাতে আরতি হইত—ঠাকুরকে লইয়া আমরা দেখিতাম। এখানে ঠাকুর আমাদের ষোলআনা তীর্থের কার্য্য করাইয়া লইতেন। এইরূপভাবে ৪।৫ দিন চিত্রকূটে থাকিয়া আমরা জব্বলপুর গেলাম। জব্বলপুরে মার্ব্বেল রক্, নর্ম্মদায় শ্রাদ্ধ ইত্যাদি করা হইল। সেখানে নর্ম্মদাতীরে একটী সাধুর সঙ্গে দেখা হইয়াছিল—তিনি ঠাকুরকে চেনেন। তিনি প্রখর রৌদ্রের মধ্যে বসিয়া সূর্য্য উপাসনা করিতেন। জব্বলপুর হইতে বোম্বাই গেলাম, এবং সেখানে সহরের উৎকৃষ্ট ধর্ম্মশালায় ছিলাম। সেখানে ৪।৫ দিন থাকিয়া নাসিকে আসিলাম। চৈত্র সংক্রান্তির দিন পিতৃপুরুষদের শ্রাদ্ধ করা হইল এবং ঠাকুরকে ফুল দিয়া সাজাইয়া, গোদাবরী তীরে, আমরা সকলে গুরুপূজা করিলাম। সেই দৃশ্য, ও সেই ভাব, না দেখিলে বর্ণনা করা যায়না। সেখানে ঠাকুর ৫০০ শত ব্রাহ্মণকে দান করিলেন। পাণ্ডবগুহা, গৌতম মুনির আশ্রম ইত্যাদি দেখিলাম। নাসিকে ৭।৮ দিন থাকিয়া আবার বোম্বাই হইয়া দ্বারকায় গেলাম। দ্বারকায় এক একটী বিগ্রহ দর্শন করিতে ঠাকুর ১।১॥০ ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিতেন। সেখান হইতে ষ্টীমারে বেট দ্বারকায় গেলাম। যেখানে যাই—সকলেই ঠাকুরকে বিস্মিত নয়নে দেখিতে থাকে এবং বিশেষ আদর-যত্ন করে। দ্বারকা হইতে বৃন্দাবনে আসিলাম। সেখানে গরমের জন্য বিশেষ কিছু করা গেলনা। ভাই, ঠাকুরের সঙ্গে যাইয়া জীবন ধন্য হইয়াছে।

নাসিক হইতে ফিরিয়া আসিয়া ৭ই মে তারিখে যতীন পাল দাদা সমস্ত গুরুভাইদের সহ ঠাকুরকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া খুব উৎসব করিলেন এবং ১১ই মে তারিখে গোঁসাইএর তিরোভাব উৎসবের জন্য ঠাকুর পুরী রওনা হইয়া গেলেন।

১৯২৭ সালের গোঁসাইএর তিরোভাব উৎসব

২৫শে মে উৎসবের জন্য বসন্ত দাদার সঙ্গে স্ত্রীকে পুরী পাঠাইয়া দিলাম। আমি নিজে যাইতে পারিলাম না। ঠাকুর তাহাকে খুব যত্ন করিলেন এবং অন্ততঃ স্নানযাত্রা পর্য্যন্ত থাকিতে বলিলেন। ৭ই জুন স্ত্রীর চিঠিতে জানিলাম, তাহার টাকা-পয়সা ফুরাইয়া গিয়াছে। আমি ঐদিনই টেলিগ্রাম মনিঅর্ডারে টাকা পাঠাইয়া এখানে চলিয়া আসিতে লিখিলাম। তাহাতে আমার স্ত্রী ব্যস্ত হইয়া ভাবিল, বোধ হয় আমার কোনও অসুখ হইয়াছে, সেই জন্য টাকা পাঠাইয়াছি এবং আসিবার জন্য ব্যস্ত হইল। ঠাকুর কিন্তু বলিলেন যে চিন্তার কোন কারণ নাই। কিন্তু আমার স্ত্রী ব্যস্ত হইয়া টেলিগ্রাম করিল এবং টেলীগ্রামের ভাল জবাব আসিলে, স্নানযাত্রা পর্য্যন্ত ওখানেই থাকিয়া যাইবে স্থির করিল। আমি অত বুঝিতে না পারিয়া, টেলীগ্রামের জবাবে টেলীগ্রাম না করিয়া, একখানা চিঠি লিখিলাম। ঐ দিনের মধ্যে টেলীগ্রাম না পাইয়া স্ত্রী রাত্রের গাড়ীতে কলিকাতা চলিয়া আসিল। ঠাকুর আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। আমি স্ত্রীর নিকট এই সকল কথা শুনিয়া আবার তাহাকে লইয়া ঐ রাত্রেই পুরীতে রওনা হইয়া গেলাম। সকলে অবাক! ঠাকুর আমাকে দেখিয়া প্রথমটা তিরস্কার করিলেন, কেন আমি টেলীগ্রাম করিয়া জানাই নাই।

শেষে আমার মনের অবস্থা বুঝিয়া বলিলেন, "বেশ করিয়াছ, এই রকম করিয়াই তো আসিতে হয়।" আমি ৩।৪ দিন সমুদ্র ধারের ঠাকুরের "পুলীন পুরী" বাটীতে বাস করিলাম। ঠাকুরও রাত্রে সেখানে আসিতেন এবং উপরে থাকিতেন। আমিও শ্রীযুক্ত রোহিনীকাকা নীচে এক জায়গায় শুইয়া থাকিতাম এবং ঠাকুরের সম্বন্ধে নানা বিষয় কথা-বার্ত্তা বলিতাম। সকালবেলা ঠাকুরের সঙ্গে আশ্রমে আসিতাম। ঠাকুর আসিবার সময় পথে গরীব দুঃখীকে পয়সা ছড়াইতে ছড়াইতে আসিতেন এবং জগন্নাথদেব দর্শন করিয়া আসিতেন। শুনিলাম পুরী থাকিতে ইহা তাঁহার নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য। স্নানযাত্রা দেখিয়া কলিকাতা ফিরিয়া আসিলাম।

ঠাকুরের কাটোয়া ও অন্যান্য বৈষ্ণব তীর্থে গমন

এবার মহাহোমের পর কাটোয়াস্থ আমাদের একটী গুরুভাইএর আগ্রহাতিশয্যে ঠাকুর কাটোয়া গেলেন। সেখান হইতে শ্রীখণ্ড ইত্যাদি বৈষ্ণবদের বহু তীর্থস্থান দেখিয়া অক্টোবরের শেষে ফিরিয়া আসিয়া আশু পালের বাড়ীতে উঠিলেন। ১লা নভেম্বর ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম এবং তাঁহার নিকট হইতে ঐ সকল বিবরণ শুনিলাম। বৃদ্ধ বৈষ্ণবদের খুব প্রশংসা করিলেন এবং তাঁহাকে দেখিতে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল বলিলেন।

আবাহনও নাই বিসর্জ্জনও নাই

এই সময়ে আমার জীবনে একটী দুঃখময় ঘটনা অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটিল। আমার একটী নিকট আত্মীয়কে শিশুকাল হইতে সহোদর ভ্রাতার ন্যায় লালন পালন করিয়া আসিতেছিলাম এবং বি-এল পাশ করাইয়াছিলাম। সে অত্যন্ত সচ্চরিত্র বুদ্ধিমান ও বিনয়ী ; তাহার কার্য্য-কলাপে আমাদের ধারণা ছিল যে, সে আমাদের উপর অনুরক্ত। সেও ঠাকুরের নিকট দীক্ষা লইয়াছিল। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ তাহার কি হইয়াছে সে আর আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিত না এবং একদিন আমাদের না বলিয়া বাড়ী হইতে পলাইয়া গেল। কেন যে ঐরূপ ভাবে গেল তাহা আজ পর্য্যন্তও জানি নাই। পরদিন স্নেহেরবশে তাহাকে খোঁজাখুঁজি করিয়া ধরিয়া আনিলাম বটে, কিন্তু সে পরিষ্কার বলিল যে, আমাকে ছাড়িয়া যাইবে এবং আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিবে না—কিছুতেই তাহাকে রাখিতে পারিলাম না। প্রাণে বড়ই আঘাত পাইয়া ঠাকুরকে সব বলিলাম। ঠাকুর সব শুনিয়া বলিলেন—

আমাকে যখন সে তাহার জীবনের এত বড় ঘটনার কথা কিছুই বলে নাই, তখন আমিও তাহাকে কিছুই বলিব না—আর তুমিই বা কেন তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে গেলে ? তোমার পক্ষে আবাহনও নাই বিসর্জ্জনও নাই এইরূপ ভাব হওয়াই উচিত। তাহার ইচ্ছা হয় আসিবে, না হয় না আসিবে। যখনই কৃতজ্ঞতা দেখাইবার সময় উপস্থিত হয় তখনই লোকে এইরূপ করিয়া থাকে। ইহাতে দুঃখ কি ?

ঠাকুরের কথায় প্রাণ শীতল হইল। ঠাকুর আমাকে যাহাতে কাহারও মায়ায় আবদ্ধ না হই তাহা শিখাইলেন। আমি এখনও তাহাকে সমানভাবে সহোদর জ্ঞানে স্নেহ করি, কিন্তু তাহার উপর স্নেহের যে বিশেষত্ব ছিল তাহা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। "আবাহনও নাই বিসর্জ্জনও নাই"—এই নীতি অবলম্বন করিতে পারিলে নির্লিপ্ততা শিক্ষা করিবার যে কত সহায়তা হয় তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। যত-খানি ভালবাসা তাহাকে ঢালিয়া দিয়াছিলাম, তাহাকে কাছে না পাইয়া, সেই ভালবাসা অন্য গুরুভ্রাতাদের উপর তাহার মত সহোদর জ্ঞান করিয়া সমানভাবে বিলাইয়া দিতে শিখিয়াছি—তাহাতেও কি আনন্দ! কি শান্তি!

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে লইয়া উৎসব

কিছুদিন পরে ঠাকুর চন্দননগর গেলেন এবং অগ্রহায়ণ মাসে গৌরাঙ্গের বিবাহ দেওয়াইয়া বড়দিনের বন্ধের সময় কলিকাতা আশুপাল দাদার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। বড়দিনের বন্ধের মধ্যে একদিন সকল গুরুভ্রাতা মিলিয়া ঠাকুরকে লইয়া দক্ষিনেশ্বর গেলাম। এবারও পঞ্চবটীমূলে ঠাকুর বসিলেন। বিজয়দাদা মধুর গোষ্ঠ কীর্ত্তন করিলেন। সকলে আনন্দ করিয়া গাছতলায় খিচুড়ী প্রসাদ-ভোগ লাগাইয়া পাইলাম।

১৯২৮ সালে বাঁকুড়া গমন

আরম্ভ বৎসর হইতেই ঠাকুরের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। ডায়েবেটীজ রোগের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। শরীরে মাত্রই বল নাই। হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য গুরুভ্রাতা বাঁকুড়ার ডিষ্ট্রিক্ট সবরেজিষ্ট্রার সন্তোষবাবু ঠাকুরকে বাঁকুড়ার নিকট শুশুনা পাহাড়ে কিছুদিন যাইয়া থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ঠাকুর ৪ঠা জানুয়ারী বাঁকুড়া রওনা হইয়া সেখান হইতে শুশুনা পাহাড়ে গিয়া কিছুদিন থাকিলেন—তাহাতে শরীর অনেকটা সুস্থ হইল।

ঠাকুরের ট্রাষ্ট ডিড্

ঠাকুর তাহার পর পুরী, ভুবনেশ্বর, কাশী ইত্যাদি স্থানের সমুদয় সম্পত্তি পুরীধামস্থ বিগ্রহত্রয়—শ্রীশ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীশ্রীমতী যোগমায়াদেবী ও শ্রীশ্রী৺বিষ্ণুচক্র শালগ্রামশিলাকে দান করিয়া একখানি ট্রাষ্ট দলিল সম্পাদন করিলেন। এটর্ণী আপীস হইতে উহার খসড়া প্রস্তুত হইল এবং আলীপুরে রেজেষ্ট্রী করিবার জন্য কমিশনার নিযুক্ত হইল। ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ঠাকুর মহানন্দ দাদাকে লইয়া আমার ভবানীপুরের বাড়ীতে আসিলেন এবং সেইখানেই দলিল রেজেষ্ট্রী হইল। শিষ্যগণের উপর তাঁহার কি অগাধ স্নেহ ছিল, তাহা এই দলিল হইতে বিশেষভাবে প্রমাণ হয়। ৮ই ফেব্রুয়ারী ঠাকুর পুরী চলিয়া গেলেন।

ঠাকুরের রাঁচি গমন

ঠাকুরের শরীর ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। পুরী হইতে খবর পাইতেছি যে ঠাকুর বড়ই অসুস্থ। ৩।৪ মাস পুরীতে থাকিয়া কোনও উপকার হইতেছে না। হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য ঠাকুর রাঁচি যাইয়া কিছুদিন থাকিবেন ইচ্ছা প্রকাশ করায় গুরুভ্রাতা অচ্যুৎদাদা রাঁচি গিয়া একখানি বড় বাড়ী ভাড়া করিলেন। ঠাকুর ২৪শে জুলাই কলিকাতা আসিয়া ৭ই আগষ্ট রাঁচি রওনা হইয়া গেলেন। রাঁচিতে একমাস থাকিয়া একটু সুস্থবোধ করিলেন এবং মহাহোমের পূর্ব্বে আবার চন্দননগর ফিরিয়া আসিলেন। এবারেও মহাহোমে রীতিমত যোগদান করিলেন।

গুরুবাদ সম্বন্ধে কথা

গ্রহণ উপলক্ষে ঠাকুর কাশী যাওয়ার জন্য অক্টোবরের শেষে চন্দননগর হইতে আশুপাল দাদার বাটীতে আসিলেন। ঠাকুরের শরীর খুবই দুর্ব্বল। সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বেশী বলিতে পারেন না। পঞ্চমখণ্ড "সদ্‌গুরুসঙ্গ" প্রকাশ করিবার জন্য তখন খুব পরিশ্রম করিতেছেন। ২।৩ মাস মধ্যে উহা বাহির করিতে হইবে। ২রা নভেম্বর আমরা সকলে বসিয়া আছি—ঠাকুর পঞ্চমখণ্ড বাহির করা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। বলিতে বলিতে গুরুনিষ্ঠা সম্বন্ধে কথা উঠিল। ঠাকুর বলিলেন,

গুরু ভগবানের একটী প্রতিশব্দ (synonym)। এক গুরু-নিষ্ঠাতেই সকল হয়। মানুষ যাহা কিছু সৎ কল্পনা করিতে পারে সকলই গুরুতে আছে।" তখন তিনি এক হাতে

নিজের দেহটি চাপড়াইয়া বলিলেন "এটা গুরু নয়—যে শক্তিতে এটা হইয়াছে তাহাই গুরু—সেই শক্তি ছাড়া আমার একটী হস্ত উত্তোলন করিবার শক্তিও নাই। গুরুতে সমস্ত সৎগুণ আরোপ করিতে হয়। তাহা হইলে আমি যে এই হাত খানা উত্তোলন করিলাম, ইহাতে যে সদ্‌গুণ আরোপ করে তাহার যে মনের ভাব হইবে, যে উহা করে না, তাহার অন্যরূপ হইবে। গুরু সদ্‌গুণের আধার। গুরু নিষ্ঠা হইলে সকলই হইল। মহাদেব পার্ব্বতীকে যোগ ইত্যাদি বিষয়ে অনেক উপদেশ দিলেন, শেষে যখন গুরু গীতায় গুরুর সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করিলেন তখন আর বেশী কথা বলিতে পারিলেন না। গুরুতত্ত্ব ভাষায় বুঝান যায় না। উহা ভিতরের জিনিষ। তাই স্বয়ং মহাদেব আর কোনও ভাষা না পাইয়া বলিলেন—

"ন গুরো রধিকং তত্ত্বং ন গুরো রধিকং তপঃ।

ঐখানেই শেষ। গুরু বাক্য অবিচারে প্রতিপালন না করিলে গুরুতত্ত্ব সম্যক উপলব্ধি করা যায় না। গুরু বাক্য প্রতিপালন করার নামই গুরু নিষ্ঠা। তবে গুরুর রক্ত মাংসের দেহের ঐকান্তিক সেবা করিলেও ক্রমে ফল পাওয়া যায়।"

ঠাকুরের জন্মোৎসব

ঠাকুর দুই এক দিন পরেই গ্রহণের স্নান করিতে কাশী চলিয়া গেলেন। ২৬শে নভেম্বর বৈকুণ্ঠ চতুর্দ্দশীতে ঠাকুরের জন্মোৎসব। সকল গুরুভ্রাতারা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় ঠাকুর ১৫।১৬ দিন মাত্র কাশীতে থাকিয়া আবার কলিকাতা আসিলেন। বিশেষ সমারোহের সহিত আশুপাল দাদার বাটীতে এবারও জন্মোৎসব হইল এবং ঠাকুরকে ফুল দিয়া সাজান হইল। বিজয়দা কীর্ত্তন করিলেন। ৪।৫ দিন পরেই ঠাকুর পুরী চলিয়া গেলেন।

১৯২৯

তারকেশ্বর গমন

পুরীতে অল্প কিছুদিন থাকিয়া ঠাকুরের শরীর অত্যন্ত খারাপ হইল চিকিৎসার জন্য বৎসরের প্রথমেই কলিকাতা আসিলেন। এখানে বড় বেশী ভিড় হয় বলিয়া, মাঝে মাঝে চন্দননগর গিয়া থাকিতেন—সেখানে একটু নিরিবিলি থাকার সুবিধা ছিল। পায়ে জোর পাইতেন না এবং অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে হাটিতে চলিতে পারিতেন না। শরীরও ক্রমে অস্থিচর্ম্মসার হইয়া যাইতে লাগিল। সোনার গৌরবরণে যেন কালিমা ঢালিয়া দিয়াছে!

গুরুভ্রাতা চুণীলাল খাঁ মহাশয় তারকেশ্বরে ব্যবসা করেন। তাঁহার নিতান্ত আগ্রহ, ঠাকুরকে একবার তারকেশ্বর লইয়া যান। ঠাকুরও তারকেশ্বর দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমরা সকলে ঠাকুরকে লইয়া ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারকেশ্বরে গেলাম। ঠাকুর তারকেশ্বরের মন্দিরের ভিতর যাইয়া পূজা করিলেন এবং ১০৲ টাকা প্রণামী দিলেন। চুণীদাদা প্রায় ২০০ শত লোকের বিশেষ পরিপাটীরূপে ভোগের আয়োজন করিলেন। ঠাকুর অল্প কিছুদিন পরেই পুরী চলিয়া গেলেন।

১৯২৯

মহাহোম

পুরী হইতে সংবাদ পাইতেছি যে ঠাকুরের শরীর অত্যন্ত অসুস্থ। ৪।৫ মাস পুরীতে থাকিলেন, কিন্তু শরীরের কোনও উপকার হইতেছে না। মহাহোমের পূর্ব্বে অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় কলিকাতায় আসিয়া চন্দননগর গেলেন। এবারকার মহাহোমের জন্য সকল গুরুভাইএরই বিশেষ চিন্তা হইল। ঠাকুর এইরূপ শরীর লইয়া নিজে মহাহোমে যোগ দিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ হইল। জোরে কথা বলিতেই ঠাকুরের কষ্ট হয়। তাহাতে সমস্ত চণ্ডীখানি ঐরূপ হোমকুণ্ডের সম্মুখে বসিয়া ৪।৫ ঘণ্টা পাঠ করা কত ক্লেশকর, ভাবিয়া আমরা ঠাকুরের যোগদান সম্বন্ধে নিরাশ হইলাম। ঠাকুরের শরীর অত্যন্ত খারাপ বলিয়া, বহু গুরুভ্রাতা মফঃস্বল হইতে এবার চন্দননগরের মহাহোমে আসিয়াছেন। সপ্তমীর দিন সারাদিন ঠাকুর অত্যন্ত কাতর হইয়া শুইয়া রহিলেন। মহাষ্টমীর দিন ভোর হইতেই মহাহোমের যোগাড় হইতে লাগিল। ঠাকুর হোমে যোগদান করিতে পারিবেন কিনা তখনও ঠিক নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—ঠিক সময়ে ঠাকুর উঠিয়া আসিয়া হোমের সম্মুখে আসনে বসিলেন এবং ঠিক অন্যান্য বৎসরের ন্যায় সমানভাবে সমগ্র চণ্ডীপাঠ ও আহুতি দান সম্পন্ন করিলেন। কোথা হইতে এইরূপ দুর্ব্বল শরীরে যে শক্তি আসিল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তখনও বুঝিতে পারি নাই যে ঠাকুরের দেহাশ্রিত অবস্থায় এই শেষ মহাহোম হইয়া গেল!

হোমের পর সকল গুরুভ্রাতাগণ মিলিয়া প্রতি বৎসরই meeting (মিটিং) করিতেন। তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য যাহাতে এই অনুষ্ঠানটী চিরকাল বজায় থাকে এবং সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। এবারও আমরা সকলে meetingএ

বসিলাম। ঠাকুরের শরীরের অবস্থা দেখিয়া সকলেরই মনে বিশেষ আশঙ্কা হইল এবং সকলেই ঠাকুরের অবর্ত্তমানে এই শুভ অনুষ্ঠানটী যাহাতে বজায় থাকে তাহার জন্য আলোচনা করিতে লাগিলেন। ঠাকুর হোমের পর বিশ্রাম করিয়া একটু সুস্থ হইলে আমাদের এই উৎসাহের কোলাহল তাঁহার কাণে গেল। তিনি তখন জিতুদাও মহানন্দদাকে ডাকিয়া বলিলেন "আজ আমার বড়ই আনন্দ হইতেছে—আমাকে উহাদের কাছে লইয়া চল।"

তখন ঠাকুরকে ধরিয়া আনিয়া মিটিংএর মধ্যে একখানি ইজিচেয়ারে আসন করিয়া দেওয়া হইল। ঠাকুর তাহাতে বসিয়া সকলের দিকে অতি কাতর দৃষ্টিতে একবার চাহিলেন। ঠাকুরের এই অবস্থা দেখিয়া বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তখনও বুঝি নাই—সকলের সমক্ষে ঠাকুরের এই শেষ কথা! ঠাকুর আস্তে আস্তে বলিতে লাগিলেন।

"তোমাদের আজিকার উৎসাহ দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইতেছে—আমার চক্ষের জল আসিতেছে। মহা-হোমের এই অনুষ্ঠানটী বড়ই শুভ। ইহা ভারতবর্ষ হইতে একেবারে লোপ পাইয়াছিল। আমি চন্দন নগরে ইহার প্রবর্ত্তন করিয়াছি বলিয়া, ভোলা গিরি মহারাজ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ আমাকে বিশেষ আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। তোমরা যে ইহা রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছ তাহাতে আমার বড়ই আরাম বোধ হইতেছে।

আমি যখন প্রথম পাহাড় হইতে আসিলাম, তখন গৌরাঙ্গের পিতা ৺নলিনাক্ষ তাঁ আমার সমস্ত ভার লইল। ওরকম একটী ছেলেই আর দেখা যায় না। তাহার বুদ্ধি, কার্য্যকুশলতা এবং সমান ভাবে সাধন নিষ্ঠার তুলনা নাই। সেই আমাকে বলিল

যে আমার জন্য একটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকিবার স্থান করিয়া দিবে। যেন আমার কাহারও উপর মুখাপেক্ষী না হইতে হয়। তাহারই উদ্যোগে জিতুর বাড়ীর নিকট এই জায়গা সর্ব্ব প্রথম লওয়া হয় এবং ইহাতে একতালা ছোট বাড়ী করা হয়। আমি কলিকাতা আসিলে এই চন্দন নগরে আসিয়াই থাকিতাম। এই জায়গাই আমার প্রথম স্বতন্ত্র স্থান। তারপর এই বাড়ী নির্ম্মাণ জন্য আমি নিজেও নলিনের পরিবার বর্গ সকলে খাটিয়াছি। রাত্রে অবসরের সময় উহাদের লইয়া ছাদ পর্য্যন্ত পিঠাইয়াছি। এবং এই খানেই মহাহোমের প্রবর্ত্তন করিয়াছি। তারপর আস্তে আস্তে আরও জমী খরিদ করিয়া এখন এইরূপ হইয়াছে। আমার অভাবে তোমারও এই খানেই এই মহাহোম প্রচলিত রাখিবে। আমার অভাব হইলে এই খানে আসিলেই তোমাদের আমাকে স্মরণ হইবে—তখন মনে হইবে "ঐ স্থানে ঠাকুর বসিতেন." "ঐ স্থানে বসিয়া আমার সঙ্গে ঐ কথা বলিয়াছিলেন"ঐ গাছটী তিনি নিজে স্বহস্তে রোপন করিয়াছেন" ইত্যাদি। তাহাতে তোমাদের কল্যাণ হইবে। অন্য স্থানে এই অনুষ্ঠানটী করিলে এই সকল স্মৃতি হইবে না। আমার অভাবে আমার স্মৃতি তোমাদের আনন্দ দান করিবে এবং এই স্থানে আমার স্মৃতি যত থাকিবে অত আর কোথায় নয়। হয় তো বা কোনও সময় তোমরা চাউল ডাইল সঙ্গে লইয়া এই খানে আসিয়া দুইদিন থাকিয়া রান্নাবান্না করিয়া খাইয়া যাইবে। আমার আজ বড় আনন্দের দিন। আমি তোমাদের উৎসাহ দেখিয়া আর থাকিতে পারিলাম না।"

ঠাকুরের অপার দয়া ! কি গভীর স্নেহ !

মিটীংএর কার্য্য বন্ধ হইয়া গেল। আমরা সকলে ঠাকুরকে ঘিরিয়া বসিলাম। গুরুভ্রাতা ইন্‌জিনিয়ার শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ই এই মিটীংএর প্রধান উদ্যোক্তা এবং তাঁহার সাধন ভজনে অসাধারণ অনুরাগ। সকল গুরুভ্রাতাদের মধ্যে বেশ একটা সঙ্ঘবদ্ধভাব বজায় থাকে, এইরূপ আন্তরিক ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া, তিনি এই সকল বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি ঐরূপ মনের ভাব লইয়া ঠাকুরকে বলিলেন—

"আমাদের মধ্যে অনেকে ভাল করিয়া সাধন ভজন করেন না এমন কি অনেকে দীক্ষা লইয়া এদিকের সঙ্গে মেলা-মেশার সুযোগও পান নাই।" ঠাকুর বলিলেন "যাহারা নিয়মমত সাধন-ভজন করিয়া যাইবে, তাহারা কৃতার্থ হইবে। যাহারা করিবে না, তাহাদের জন্যও চিন্তা নাই। হয় দু'দিন আগে, না হয় দু'দিন পরে। এই সাধনব্যক্তিগত সাধন। তবে যেমন একটী জ্বলন্ত অঙ্গার এক জায়গায় পড়িয়া থাকিলে বেশীক্ষণ জ্বলিতে পারে না, কিন্তু কতকগুলি অঙ্গারের সঙ্গে থাকিলে সকলগুলি একসঙ্গে জ্বলিতে থাকে—সেই হিসাবে একটা সংঘবদ্ধ হওয়া দরকার। নতুবা সকলকেই পৃথক পৃথক ভাবে নিজ নিজ কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে।"

ঠাকুর উঠিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। বিজয়া দশমীর দিন আমরা অনেকে যাইয়া ঠাকুরের পদধুলি ও আশীর্ব্বাদ লইলাম। তখনও জানিনা এইবারই শেষ !

ঠাকুরের গয়া এবং প্রয়াগের কুম্ভমেলায় গমন

ঠাকুরের দেহাশ্রিত অবস্থায় ইহাই শেষ কার্য্য। আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি ইহা নিজ চক্ষে দেখিতে পারি নাই বলিয়া, অন্যান্য গুরুভ্রাতা, যাঁহারা এই সময়ে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, তাঁহাদের নিকট হইতে শুনিয়া লিখিয়া রাখিয়াছি। যাহা শুনিয়াছি তাহাতেই বুঝিতে পারিয়াছি যে, ঠাকুরকে অন্যান্য সাধুগণ কত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। ঐ সময়ে তাঁহার সঙ্গে থাকিতে পারিলে কৃতার্থ হইয়া যাইতাম।

১৯৩০ সালের প্রথম হইতেই ঠাকুরের শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। শরীরে আর মোটেই বল পাইতেন না। বিশেষতঃ পায়ের জোর একেবারেই তিরোহিত হইয়াছিল। কেহ ধরিয়া না উঠাইলে দাঁড়াইতে পারিতেন না। পুরীতে শরীর কিছুতেই ভাল হইতেছিল না বলিয়া, হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য অন্য স্বাস্থ্যকর স্থানে যাওয়ার চেষ্টা হইতেছিল। কোন সময়ে রাঁচি, কোনও সময়ে রাজগিরি, ইত্যাদি স্থানে যাওয়ার কথা আলোচনা হইতেছিল। ঠাকুর নিজে হইতে শেষে গয়ায় যাইবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং গয়াতে ব্রহ্মকুণ্ড পাহাড়ের নীচে ফাঁকা জায়গায় বেশ সুন্দর একখানি বাড়ী পাওয়া গেল। কি উদ্দেশ্য লইয়া লইয়া যে শেষ অবস্থায় ঠাকুর এত জায়গা ছাড়িয়া গয়া যাওয়ায় স্থির করিলেন, তাহা বলা কঠিন। হয়তো বা তিনি নিজে স্থির বুঝিয়াছিলেন যে, আর বেশীদিন এই নরদেহে থাকিবেন না। হয়তো বা সেইজন্যই তাঁহার প্রিয় সাধনার স্থান গয়াধামকে একবার শেষ দর্শন করিয়া, শ্রীবিষ্ণু পাদ-পদ্মে প্রাণের নিবেদন জানাইয়া আসিবেন। ঠাকুরের ভিতরের অবস্থা

কখনই বাহিরে প্রকাশ করেন নাই। তিনি আমাদের মধ্যে থাকিয়া যেন আমাদেরই মত একজন, এইরূপ ভাব দেখাইয়া, আমাদের চক্ষে ধূলা দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গভীর সাধনা ও ভিতরের অবস্থা প্রকাশ করার সাধ্য কাহারও নাই। দিবারাত্রি যে কিভাবে মগ্ন থাকিতেন তাহা বাহিরের কাহাকেও বুঝিতে দিতেন না। কেবল একটু লক্ষ্য করিয়া সেই দীপ্তিমান্ চক্ষু দুটী দেখিলে বুঝা যাইত, তিনি সকল সময় অন্য আর এক রাজ্যে বিরাজ করিতেছেন। সে রাজ্যের কথা বুঝিবে কাহার সাধ্য আছে? তিনি যে কি উপভোগ করিতেন—সর্ব্বদা কি আনন্দ লইয়া থাকিতেন, তাহার একটু কণামাত্রও বুঝিবার সাধ্য কাহারও ছিল না। যে ভীষণ রোগের শারীরিক জ্বালায় তিনি অহোরাত্রি দগ্ধ হইতেন, তাহার দিকে তাঁহার বিন্দুমাত্রও দৃষ্টি ছিল না। শারীরিক কষ্ট একেবারে তুচ্ছ করিয়া সদা-সর্ব্বদা হাস্যমুখে সকলের দিকে তাকাইতেন। একটীবারও মুখে উঃ আঃ শব্দ করিতে কেহ শুনে নাই। এইরূপ শরীরের অবস্থা লইয়া তিনি গয়াধামে রওনা লইলেন।

বসন্ত দাদার নিকট শুনিয়াছিলাম, গয়াতে যাইয়া ঠাকুর অত্যন্ত প্রফুল্লচিত্তে কাল কাটাইয়াছিলেন। যাহারা কাছে ছিল সকলকেই বিষ্ণু-পাদপদ্মে পিণ্ডদান ও শ্রাদ্ধ কার্য্যটী সুসম্পন্ন করাইলেন। বসন্ত দাদার বিমাতার এই সময় মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার শ্রাদ্ধের কার্য্য ঠাকুরের কথায় বসন্ত দাদা গয়াতেই করিলেন। ঠাকুর গয়ায় পিণ্ড দানের ফল সম্বন্ধে বলিতেন। গয়া সাধন-ভজনের পক্ষে অতি উপযুক্ত স্থান বলিয়া সকলকে বিশেষভাবে সাধন-ভজন করিতে বলিতেন।

কিছুদিন গয়ায় থাকিয়া ওখান হইতে রাজগিরি গেলেন। রাজ-গিরিতে কিছুদিন থাকিয়া শরীর অনেকটা সুস্থ হইল। মাঘ মাসের প্রথম হইতেই এলাহাবাদে গঙ্গার তীরে একটী বাড়ী স্থির হইল। এবার প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভ হইবে। ঠাকুর সকলকে লইয়া কুম্ভ দর্শন করিবার জন্য সেই

বাড়ীতে গেলেন। বাড়ীটি সহরের মধ্যে। কুম্ভ হইতে অনেক দূরে। সেখান হইতে প্রতিদিন নৌকা করিয়া ঠাকুরকে লইয়া সকলে ত্রিবেণীতে স্নান করিবার জন্য যাওয়া হইত। ঐরূপ অবস্থায় ঠাকুর প্রতিদিন ত্রিবেণীতে স্নান করিতে পারিতেন না। তবে প্রায়ই তাঁহাকে লইয়া সাধু-সন্ন্যাসী দর্শনের জন্য কুম্ভমেলার মধ্যে লইয়া যাওয়া হইত। তিনি বহু সাধু-সন্ন্যাসীকে দর্শন করিয়া, যাঁহার যেরূপ মর্য্যাদা তাঁহাকে সেইরূপ প্রণামী দিলেন। সাধুসন্ন্যাসীগণও একদৃষ্টে তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিতেন এবং খুব শ্রদ্ধা দেখাইতেন। শ্রীশ্রীমৎ শান্তদাস বাবা ঠাকুরকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। ঠাকুর তাঁহারই হস্তে সাধুদের ভাণ্ডারা দিবার জন্য ২০০০৲ দুই হাজার টাকা দিয়াছিলেন এবং তিনি একদিন ঐ টাকা দ্বারা ভাণ্ডারা দিয়া বহু সাধু বৈষ্ণবদিগের সেবা করাইয়াছিলেন। ঠাকুরকে দেখিয়া সকল সম্প্রদায়ের সাধু-সন্ন্যাসীগণ অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। নানক সাহি এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের অনেকে আসিয়া তাঁহাকে কুম্ভমেলায় ছাউনি করিয়া তাঁহাদের অগ্রণী হইয়া অবস্থান করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অতি বিনয় সহকারে তাঁহার শরীরের অক্ষমতা জানাইয়া সকলকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। কুম্ভমেলা অন্তে পুরী ফিরিয়া গেলন।

নিজের প্রতিষ্ঠালাভের জন্য কোনও দিন তাঁহাকে বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করিতে দেখা যায় নাই। সর্ব্বদাই নীরব সাধনায় মগ্ন থাকাই তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব ছিল। কতদিন আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—

"আমার বড় দুঃখ, আমাকে তেমন করিয়া কেহ সাধন-ভজনের বিষয় প্রশ্ন করে না। ঐ সকল বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতে আমার কখনও ক্লান্তিবোধ হয় না। সমস্ত দিবারাত্রি আমি ঐ প্রসঙ্গ করিতে ভাল বাসি—আমাকে সাংসারিক বিষয়ে লোকে কেবল জিজ্ঞাসা করে।

তাঁহার সাধনের সময় যখন নিরবিচ্ছিন্ন গুরুসঙ্গ করিয়াছিলেন—তখন সাধনের বিষয় কত প্রশ্ন করিয়া তাঁহার গুরুদেব গোস্বামী প্রভুর নিকট হইতে কত বহুমূল্য উপদেশ আদায় করিয়া লইয়াছেন এবং সেই বহুমূল্য উপদেশ গ্রথিত করিয়া "শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ" প্রকাশ করিয়াছেন। সেই মহাগ্রন্থ মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে আর কিছুই পাঠ করিবার আবশ্যক আছে বলিয়া মনে হয় না। তাহার ভিতর সকল শাস্ত্রেরই সমাধান বর্ত্তমান আছে।

আমার স্ত্রী শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবীর কথা

আমাদের দীক্ষার পর হইতে আমার স্ত্রী শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবীর ঠাকুরের সঙ্গে যে সকল কথাবার্ত্তা হইত তাহা মধ্যে মধ্যে লিখিয়া রাখিতেন। ঠাকুরের এমন অনেক কথা আছে যাহা আমি নিজে শুনি নাই—আমার স্ত্রীর নিকট বলিয়াছেন। সেই সকল কথা আমার স্ত্রী যেভাবে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাও পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে অবিকল সেই-ভাবেই প্রকাশ করিলাম।

আমার দীক্ষা

যে মহাপুরুষের মহান্ কাহিনীর এতটুকুখানি স্মরণে ধরিয়া রাখিবার জন্য, এই আকিঞ্চনেরা এই প্রকার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতেছে, তাঁহার যে কোন প্রকার জীবনী লিপিবদ্ধ করাই আমাদের মত সাধন-ভজন হীন, অকৃতি অধম সংসারী জীবের পক্ষে আকাশ-কুসুম বলিয়াই মনে হয়। তবে সেই দয়াল দেবতা দেহে থাকিতে দু'একদিন যে দুই একটী ক্ষুদ্র ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে বর্ত্তমানে মনে হয় যে, তাঁহার দয়ার কাহিনী আলোচনা করিলেও, আমরা ধন্য হইয়া যাইব বলিয়াই তিনি ওইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। সে কথা পরে লিখিতেছি। আমাদের মনে হয় যে, তাঁহার সাধনপূত, নিত্য সিদ্ধ জীবনের অধিকাংশ ঘটনাই লোক-লোচনের অন্তরালে ঘটিয়াছে এবং তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত "শ্রীশ্রীসদ্-গুরুসঙ্গ" গ্রন্থে যে আট বৎসরের কথা জানা গিয়াছে, তৎব্যতিরিক্ত আর কোন কথাই অমন মধুর উজ্জ্বল ও সুস্পষ্টভাবে জানা যাইবে বলিয়া ভরসা নাই।

সে যাহাই হউক আমরা যেরূপ অদ্ভুতভাবে ভুবন-পাবন শ্রীগুরুদেবের অভয় চরণে স্থান পাইয়াছি তাহাই এখানে সংক্ষেপে লিখিব।

১৩১৯ সালে কবিতালোচনা প্রসঙ্গে আলীপুরের পাব্লিক প্রসিকিউটর স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের পরিবারের সহিত সুমধুর ও নিবিড় প্রীতির বন্ধনে জড়াইয়া পড়িয়াছিলাম। মিত্র মহাশয় ও তদীয় পত্নী শ্রীযুক্তা সরলাবালা দাসী আমাকে তাঁহাদের স্বর্গগতা কন্যার আসনে বসাইয়া অজস্র স্নেহ ও আদর করিতেন। সেই বাড়ীতেই জীবনে প্রথম ঠাকুরের দর্শন পাইয়াছিলাম। মিত্র মহাশয় বহুকাল হইতেই তাঁহার গুরুদেব শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর জন্মোৎসব ও জন্মাষ্টমী মহোৎসব সমারোহ

সহকারে করিতেন। ১৩২২ সালের ভাদ্র মাসের জন্মাষ্টমীর উৎসবে আমন্ত্রিত হইয়া আমি সেখানে গিয়াছিলাম। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রেবতী কাকার কীর্ত্তন শেষ হইলে, কি অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম, তাহা বর্ণনার অতীত। নানাবিধ পুষ্প-পত্র বিরচিত কৃত্রিম লতা-কুঞ্জের ভিতরে গোস্বামী প্রভুর যুগল মূর্ত্তি! ধূপ-ধুনা পুষ্পের সুগন্ধিতে সেখানে একেই যেন গোলোকের আলোক ও পুলক হাসিতেছে, তাহার পরে আপাদ বিলম্বী জটাজুটধারী পরম সুন্দর খর্ব্বাকৃতি শ্রীশ্রীমৎ ব্রহ্মচারীদেব প্রেমে বিগলিত হইয়া ঠাকুরের আরতি করিতেছেন। সে যেন মণিকাঞ্চনের পুণ্য যোগ! প্রশ্নের উত্তরে সাগ্রহে শুনিলাম, তিনি আমার ভাসুর মহাশয়ের গুরুদেব—ব্রহ্মচারী মহাশয়। তাঁহাকে দেখামাত্র মনে হইল, পৃথিবীর সব—

"বন্ধন বাসনা ভয়,
মানিয়াছে পরাজয়।
ওই, তপঃদীপ্ত রূপ হেরি,
প্রভাত সেদিন আত্মহারা।"

বিকালে হেমেন্দ্রবাবুর স্ত্রীর সহিত দেখা করিবার জন্য ঠাকুর উপরে আসিলেন। কি মন্ত্র বলে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, আজ জীবনের অপরাহ্নের স্তিমিত স্মৃতিতে সে কথা ভাল করিয়া বলিতে পারি না। সকলের সঙ্গে মিলিয়া আমিও তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। মা (হেমেন্দ্র বাবুর স্ত্রী) বলিলেন, "এটী আমার পথে কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে। সুন্দর কবিতা লিখ্‌তে পারে।"

ঠাকুরের সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়া বলিলাম, "আমার যে আরও পরিচয় আছে।" কাছেই হেমেন্দ্রবাবুর পুত্র (আমাদের গুরুভাই) পাগল বসিয়াছিল। সে বলিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আছে বই কি, উনি যে আমাদের গুরুভাই রাজেন দাদার ভাদ্রবধূ।"

ঠাকুর মধুর হাসিয়া বলিলেন, "বটে ? বেশ বেশ।" আমি তখনি কি একভাবে অভিভূত হইয়া বলিয়া উঠিলাম, "ঠাকুর, আমারও পথের উপায় আপনাকে ক'রে দিতে হ'বে।" তিনি মৃদু মধুর স্বরে কহিলেন, "কার পথ কে দেখায়। যিনি কর্ণধার তিনিই পথ দেখাবেন। তবে আজতো কত লোকের সাধন হইবে, সন্ধ্যাবেলা ভাল সময় আছে। জন্মাষ্টমী তিথি, আজ অনেক লোকের সমাগম হইবে। আজ তো একটা ভাল দিন ছিল।"

তখন ঠাকুরের কাছে দীক্ষা নেওয়া কতই কঠিন ছিল। কত লোক সাধন প্রার্থী হইয়া ফিরিয়া আসিত। আর আমাকে একবারমাত্র দেখিয়াই এবং চাহিবামাত্রই তিনি বলিলেন, "আজ তো দিন! আমি যেন অবাক হইয়া গেলাম। কি বলিব, কি বলা উচিত, বুঝিতে পারিলাম না। প্রণাম করিয়া বলিলাম, "কোথায় বসিয়া সাধন হইবে ?"

ঠাকুর। কেন ? ৭৩নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, গণেশ শ্রীমানির বাড়ীতে যেতে চেষ্টা করো, আজই কিন্তু বড় ভাল দিন।

ইহার পর ঠাকুর পাগলকে সঙ্গে নিয়া হাসিমুখে ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেলেন। আমার কানে খালি বাজিতে লাগিল, "যেতে চেষ্টা করো আজই ত তোমার দিন!"

অনেক চেষ্টা করিয়া ৫টার মধ্যে বাড়ীতে ফিরিলাম। তখন আমার স্বামী, না ব্রাহ্মমত, না হিন্দু মতের লোক ছিলেন। কখনও চোখ বুজিয়া কারও উপাসনাও করিতে দেখি নাই, কিন্তু হিন্দুর আচরণীয় ব্রত উপবাস করিলে কঠিনভাবে পরিহাস করিতেও তাঁহার মুখে আট্‌কাইত না। আমি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ ও বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনা করিতাম এবং কীর্ত্তন বড় ভাল বাসিতাম। তিনি তাহাতে বেশ একটু ঠাট্টা করিতেই ভাল বাসিতেন। তাঁহার খাদ্যাখাদ্যের কোন বিচার ছিল না এবং অত্যন্ত

মাংসাহারী ছিলেন। কিন্তু আমি তখন আমার সাংসারিক কর্ত্তব্যটুকু শেষ করিয়াই জীবনের চরম সার্থকতা হইল মনে করিতে পারিতেছিলাম না, বরং ভিতরে ভিতরে একটা অজ্ঞাত অভাব ভয়ানক ভাবে অনুভব করিতেছিলাম এবং সে অভাব মিটাইবার একমাত্র উপায় চরিতামৃতে লেখা আছে—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব,
গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ।

ইহা সত্য বুঝিয়া মনে মনে সদ্‌গুরু লাভের উপায়ই খুঁজিতেছিলাম। তাও মনে মনে; কেননা, আমার সে অনির্ব্বচনীয় অভাবের কথা মুখে প্রকাশ করার উপায় ছিল না। তবে মাঝে মাঝে ভাসুর মহাশয়ের সহিত স্বামী যে ভীষণভাবে তর্ক করিতেন, তাহাতে বুঝিতাম যে, আমিও যদি তাঁহার মতের বিরুদ্ধে কোন সাধান-প্রণালী গ্রহণ করিতে চাই, তাহাতে তাঁহার আদেশ পাইব না। কিন্তু ঠাকুর যখন এক কথাতেই আমাকে বলিলেন, "আজইতো ভাল দিন" তখন মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল, যাঁহার ইচ্ছায় "মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্" সেই অন্তর্যামীর ইচ্ছা হইলে এই অসম্ভব ব্যাপারও সত্য হইতে পারে। ভাগ্যে যাই থাক্, আজ একবার তাঁকে বুঝাইয়া দিব যে তাঁহার যেভাবে ইচ্ছা চলুন, আমি সাধন নিব, আমাকে শুধু অনুমতি দিলে তাঁর কোন ক্ষতি হইবে না।

৫টার সময় বাসায় ফিরিয়া আসিয়া দেখি, চমৎকার ব্যাপার। ১৫।২০ দিন আগে যে ননদটীর বিবাহ দিয়াছি, সেই জামাই এখানে আসিয়াছেন, এবং এখানে রাত্রে থাকিবেন। ঠাকুরপোরা দুটী ভাই বেড়াইতে গিয়াছেন, কখন আসেন ঠিক নাই। আমি কোন রকমে বাহ্যিক ভদ্রতা দেখাইয়া জামাইটীর আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলাম, কিন্তু ভিতরে যে ধাক্কা খাইলাম, তাহার বেদনার কিছু প্রকাশ বাহিরেও হইতেছিল। সন্ধ্যা

উত্তীর্ণ হইয়া গেল, অথচ স্বামী বাড়ী ফিরিলেন না, আজ আর আমার ঠাকুরের কাছে যাওয়া হইল না ; ভাবিয়া অন্ধকারে ইজি চেয়ারে পড়িয়া অবোধ বালিকার মত অঝোরে কাঁদিতে লাগিলাম। হায় ঠাকুর! এত যদি দয়াল তুমি, মুখ ফুটিয়া চাহিবার আগেই বুকের কাতর প্রার্থনা বুঝিয়া সাধন-রত্ন দিতেই যদি তুমি চাহিলে, তবে কেন তুমি সে ধন পাইবার উপায়ও তুমি করিয়া দিলে না। একি তোমার নিষ্ঠুর খেলা ঠাকুর! পাইব না যদি, তবে তখন বলিয়া দিলেই পারিতে, "নারে ভাগ্য বিড়ম্বিতা, তোর এখনও অত ভাগ্য হইবে না" কেন তবে তুমি বলিলে, আজই আমার শুভ সময়! আজই যদি সময়, তবে কি অপরাধে আমি সে অমূল্য সময় হারাইলাম। কাহাকে আমি একথা জিজ্ঞাসা করিব ?

৮।৮৷৷০টার সময় ঠাকুরপো আসিয়া বলিল, "একি, আপনি অন্ধকারে বসিয়া কাঁদিতেছেন কেন ? ব্যাপার কি ?"

তাহাকে সংক্ষেপে ব্যাপার খুলিয়া বলিতে সে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আজ ত আর হয় না! ন'টার ভিতরেই দীক্ষা শেষ হয়ে যা'বে নিশ্চয়। গেল বছর আমারও রাত্রে সাধন হ'য়েছিল। রাঙ্গাদাদার (আমার স্বামীর) ভয়ে সে কথাত কাউকে বলিনি।" তা ছাড়া তিনি মত না দিলে আপনার ত সাধন হ'তে পারে না। বেশ জানি, হয়ত বা তিনি বাড়ীতে থাকিলেও আমাকে জেদ করিয়া যাইতে দিতেন না। তথাপি একটা চেষ্টাও করিতে পারিলাম না, ইত্যাদি ভাবিয়া বড় কষ্ট বোধ হইতে লাগিল।

রাত্রি ১০৷৷০টার পর তিনি বাড়ী ফিরিলেন। নিষ্ফল বোধে তাঁহাকে ও সম্বন্ধে কোন কথাই বলিলাম না। ঠাকুরপোকে দু'তিনদিন অনুরোধ করার পর ঠাকুরের সংবাদ আনিতে পারিলাম। ঠাকুর তখন পরম শ্রদ্ধাষ্পদ ৺নলিনাক্ষ দাদাকে লইয়া ঘাটশিলায় চলিয়া গিয়াছেন।

শুনিয়া আরও মর্ম্মাহত হইলাম। কেবলই মনে হইতে লাগিল, ঠাকুর

তো আমাকে যাইতেই বলিয়া ছিলেন, আমিই তো স্বামীর অনুমতির অপেক্ষায় ঠাকুরের আদেশ পালন করিতে পারিলাম না। তখন একবারও মনে হইল না যে ভগবান মঙ্গলময়, তাঁহার রাজ্যে অব্যবস্থামত ও অমঙ্গল জনক কোন কিছুই হয় না।

আমার যে এখন দীক্ষা হইবে না, এখন যে আমি ঠাকুরকে বড় আপনার জন, ইষ্ট দেবতারূপে লাভ করিতে পারিব না, মনের এই অসহ্য গ্লানিতে তিন রাত্রি তিন দিন প্রায় কাঁদিয়া কাটাইলাম। সেও অতি গোপনে, লোক চক্ষুর অন্তরালে, কেন না জানিতে পারিলে তিনি বিরক্ত হইবেন।

এই সাধন কি, ইহার প্রণালী বা কি, তাহার সম্বন্ধে মনে তখন কোন ধারণাই ছিল না, কেবলমাত্র এই অনুভব হইতেছিল, যে সদ্‌গুরু লাভ হইলে মানুষ গুরুশক্তি প্রভাবে পরম শান্তি লাভ করিতে পারে।

তৃতীয় রাত্রি শেষে চমৎকার স্বপ্ন দেখিলাম, আমি যেন ঠাকুরের রাঙ্গা পা-ছুখানি জড়াইয়া ধরিয়া আকুলভাবে কাঁদিতেছি; আর ঠাকুর তাঁহার শত দল কান্তি দক্ষিণ হস্তখানি আমার মাথায় রাখিয়া অতি মধুর স্বরে বলিতেছেন, "কেঁদনা মা, কেঁদনা তোমার তো সময় হয়েছিল, তবু একটা বাধা ছিল বলে সেদিন যেতে পারনি। আর একটা বছর তোমায় অপেক্ষা করতে হ'ল।" আমি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম, "আমি পাব তো ঠাকুর? আপনি নিজমুখে আবার বলুন যে আমি এক বছর পরে সাধন পাব।"

ঠাকুর স্থিরভাবে বলিলেন, "পাবে বই কি অবশ্য পাবে। আমি বল্‌ছি মা, আমি যে তোমাকে সাধন দিতে বাধ্য।"

ঠাকুরের কথা শেষ হইতে না হইতে তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। জাগিয়াও ঠাকুরের জলদ গম্ভীর স্বরে উচ্চারিত শেষ কথাটী কানে বাজিতে লাগিল, "আমি যে তোমাকে সাধন দিতে বাধ্য।"

তাহার পর হইতে আমার উদ্বেগ যেন অনেকটা কমিয়া গেল। একটা অবর্ণনীয় আশায়, আনন্দে, আবার যথাপূর্ব্ব দিনগুলি কাটিতে লাগিল। দিন গেল, মাস গেল, শেষে বৎসর ঘুরিয়া জন্মাষ্টমীও আসিয়া গেল। আবার ঠাকুরপোর কাছে খবর নিলাম ঠাকুর শ্রীমানীবাবুদের বাড়ীতে আসিয়াছেন। ভাদ্র সংক্রান্তির দিনে ঠাকুরপো কলেজে যাইবার সময় তাহার কাছে ঠাকুরকে এক টুক্‌রা পত্র লিখিয়া দিলাম। সন্ধ্যাবেলা সে বাড়ী আসিয়া বলিল, "আজ আপনার চিঠি ঠাকুরের হাতে গিয়াছে, তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন "মেয়েটী কি এসেছে? না এসে থাক্‌লে কাল দুপুরে তাকে আস্‌তে বলে দাও—চিঠিতে তো কিছুই বুঝলাম না।"

সত্যই চিঠিতে কিছু বুঝাইতে পারি নাই, শুধু বোধ হয় একবার তাঁহার দর্শন চাহিয়া ছিলাম। সে রাত্রে ঘুমাইবার আগে সভয়ে স্বামীর কাছে দীক্ষার কথাটা পাড়িলাম। তাঁহাকে না জানাইয়া ব্যাপারটা এতদূর অগ্রসর হইয়াছে, ইহাতে তিনি বেশ বিরক্তি প্রকাশ করিলেন এবং কিছুক্ষণ তর্কের পর বলিলেন, "আজ রাত্রে তো ঘুমাও, কালকের কথা কাল বুঝা যাইবে।"

আমি ক্ষুণ্ণ মনে অথচ কি আশায় উৎফুল্ল হইয়া অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িলাম। ভোরে উঠিয়া দেখি উনি নিয়মিত গঙ্গাস্নানে চলিয়া গিয়াছেন। আমি ঠাকুরপোকে ডাকিয়া বলিলাম, "আমাকে আজ একটু গঙ্গাস্নানে লইয়া যাইবে?" সে হাসিয়া বলিল, "আজ যে আপনার দীক্ষা হইবে তাহা তো ঠাকুর বলেন নাই! তিনি ত শুধু আপনাকে সেখানে লইয়া যাইতে বলিয়াছেন। দীক্ষা বুঝি দুপুর বেলা হয়?" আমি বলিলাম "তিনি কাল না বলিলে কি হয়, আজ আমার কেবলি মনে হইতেছে যে, ঠাকুর আমাকে ডাকিতেছেন। আমার আজই দীক্ষা হইবে" ঠাকুরপো ঠাট্টা করিল, তা ত নয়! 'দীক্ষা' 'দীক্ষা' করিয়া আপনার মাথা খারাপ হইয়াছে। আজ আর গঙ্গায় যায় না।"

আমি তখন তাহাকে রাজী করিতে না পারিয়া মনে মনে 'গঙ্গেচ

যমুনাচৈব ইত্যাদি বলিয়া চৌবাচ্চার জলেই স্নান করিলাম। কুটনা ও ভাঁড়ারের জিনিষ গুছাইয়া দিয়াও দেখি তিনি আসিতেছেন না। একবার ভাবিলাম 'কখনও ত তিনি এত দেরী করেন না। আজ আবার আসিয়া কি বলিয়া বসেন কে জানে'। তথাপি যেন এক অদৃশ্য শক্তির প্রেরণায়, অজ্ঞাত হস্তের ইঙ্গিতে কোলের মেয়েটীর গায়ে একটী পরিষ্কার জামা দিলাম। ছেলে দুইটীকে পরিষ্কার জামা পরাইয়া, নিজে যাহা পড়িয়া দুপুরে ঠাকুরের কাছে যাইব তাহা বাহির করিলাম। ইতি মধ্যে দেখি একখানা প্রায় চলন্ত গাড়ী হইতে উনি লাফাইয়া পড়িলেন। দুই তিন সিঁড়ি লাফাইয়া লাফাইয়া উপরে আসিয়া বলিলেন, "কোথায় গেলে, শীঘ্র এস!"

আমি ত অবাক! বলিলাম "সকাল বেলা কোথায় যাইব?"

তিনি। ঠাকুর বলিয়াছেন, আমারও দীক্ষা হইবে। ৯টার সময়ই দীক্ষা হইবে, গাড়ী আনিয়াছি, আর দেরী করিও না।

আমার সবই গোছান ছিল, ঠাকুরের দয়ায় দুই মিনিটের মধ্যেই ছেলে-মেয়েদের লইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। রাস্তায়, কিসে কি হইল, কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিলাম না। কি কুহকে মুগ্ধ হইয়া, যে মানুষ আমাকে পর্য্যন্ত দীক্ষা লইতে মত দেন নাই, সেই মানুষ নিজে দীক্ষা লইতে চলিলেন, সারাটী রাস্তা তাহাই ভাবিতে ভাবিতে চলিলাম। ঠিক ৯টায় সুকিয়া ষ্ট্রীটে পৌছিয়া দেখি, আমাকে গাড়ী হইতে নামিতে দেখিয়া মহানন্দ দাদার স্ত্রী মৃদুদিদি আমাকে উপরে লইয়া যাইতে আসিয়াছে। তেতলার ঘরে গিয়াই চোখে পড়িল ঠাকুর জটাটী বাঁহাতে ধরিয়া ঘরের ভিতরে পাইচারী করিতেছেন। আমি প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই বলিলেন, "এসেছ? বাঃ তোমার বড় ভাগ্য! আজ ৭টার সময় দীক্ষা হইবে বলিয়া দুইজন দীক্ষাপ্রার্থী ভোর হ'তে এসে বসিয়া আছে, তাদের দিব, সব ঠিক, কিন্তু কি যে হইল আজ আমার, দুই তিন

বারের চেষ্টায় হোমের আগুন জ্বালাইতে অথবা হোম করিতে পারিলাম না। কি যে একটা বাধা আসিতেছে, তাহাও বুঝিতেছি না। এখন বুঝিলাম তোমার জন্যই আমার এই দেরী। তোমার যে আজ হ'বে, তাও তো বলি নাই; আর তোমার স্বামীর ত আশ্চর্য্য ভাবে হইয়া গেল! তার হবার ত কোন কথাই ছিল না।

আমি আনন্দে আত্মহারা হইলাম। ঠাকুর তখন বড়দিদিকে ডাকিয়া বলিলেন "মেয়েটীর বড় পিপাসা পাইয়াছে। উহাকে কিছু খাইতে দাও।" বাস্তবিকই ব্যস্ততার সহিত গাড়ীতে আসিয়া আমার অত্যন্ত পিপাসায় গলা শুকাইয়া গিয়াছিল। আমার স্বামী দীক্ষার পূর্ব্বে কিছু খাইতে অস্বীকার করিলেন, আমি কিন্তু একটী মিষ্ট প্রসাদ ও এক গ্লাস জল খাইলাম। সত্যই তখন মনে হইতে লাগিল, আমার এত পিপাসার কথা যে ঠাকুর কেমন করিয়াই জানিলেন তাহা ভাবিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

৯॥০টার সময় সাধন হইয়া গেল।

"পেয়েছি সে ধন ভাই পেয়েছি সে ধন,
যার লাগি কেঁদে সারা
অবশ পাগল পারা,
এতদিন ছিনু ঠিক মরার মতন;
যে ধন পাবার লাগি, কত ঋষি কত যোগী
নির্ব্বিকল্প সমাধিতে রয়েছে মগন,
পেয়েছি সে ধন ভাই পেয়েছি সে ধন!"

(মন্দির)

দ্বিপ্রহরে অপূর্ব্ব তৃপ্তির সহিত গুরুগৃহে প্রসাদান্ন পাইলাম। তখন বড়দিদি (মনোরমা) আমাকে ডাকিয়া তাঁহার ঘরে লইয়া খিল দিলেন।

বলিলেন, "তোমার দীক্ষার ব্যাপারটী কি খুলে বল। ঠাকুর লিখে রাখ্তে বলেছেন। এর আগে নাকি কি হ'য়েছিল, সব লিখে দাও।"

আমি। দীক্ষার ব্যাপার আর কি লিখিব? ঠাকুরের দয়ার ব্যাপারই আজীবন স্মরণ করিয়া ধন্য হইব।

পরে বড় দিদির অনুরোধে এবং ঠাকুরের আদেশে আমার দীক্ষার কথা বড়দিদির খাতায় লিখিয়া দিয়া বিকালে বাড়ী ফিরিলাম। ঠাকুর আসিবার সময় বলিয়া দিলেন "তুমি এসব কথা লিখে রেখো! ভবিষ্যতে গুরুভ্রাতা ভগ্নীদের সঙ্গে এসব কথা আলোচনা করেও কৃতার্থ হবে।"

ঠাকুরের সূক্ষ্ম আকর্ষণ

১লা আশ্বিন রবিবারে সাধন হইল, আশ্বিনের মাঝামাঝি আমরা সকলেই কাশী, অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ, হরিদ্বার, ডেরাডুন, দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি পর্য্যটন করিয়া আসিলাম। ৮ মাসের শিশু সন্তানকে লইয়া অসম সাহসে কেবলমাত্র গুরুদেবের চরণ ভরসাতেই সুদূর দেশে যাত্রা করিয়াছিলাম, তাঁহার দয়াতেই কোথাও এতটুকু কষ্ট পাইতে হয় নাই, তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম। কিছুদিন পরে (২৬শে ডিসেম্বর) ঠাকুরকে দর্শন করিবার জন্য মনে হঠাৎ একটা প্রবল ব্যাকুলতা আসিয়া পড়িল। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে পিত্রালয়ে গিয়াছিলাম; ১টী ভাইকে সঙ্গে লইয়া সুকিয়া ষ্ট্রীটে চলিয়া গেলাম। ঠাকুর তখন কোথায় কিছুই জানিতাম না। গিয়া

দেখি, ঠাকুর বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া তিলক সেবা করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "এই যে, প্রফুল্ল, ভবানীপুরে তোমায় কে খবর দিল, যে আমি আজ পুরী হ'তে এসেছি? ১১টায় এসেছি, আবার কাল ৩টায় কাশীতে যাচ্ছি। কাল বিকালে এলে আর আমার দেখা পেতে না।"

আমি বলিলাম, "খবর কিছু পাই নাই বলে মনটা যেন কেমন হ'ল, ভাব্‌লাম আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে আছি, একবার দেখে আসি।"

ঠাকুর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক ওই রকম ভাবে, কলিকাতার নানা স্থানের লোক টের পেয়ে গেছে যে, আমি এসেছি। ঠাকুরের খেলা দেখ! আশ্চর্য্য বটে!

আমার মনে হইল, ঠাকুর তাঁহার ঠাকুরের খেলা'ই সবের ভিতরে দেখিতেছেন, কিন্তু ইহাতে আমরা আমার ঠাকুরের খেলা ও দয়ার পরিচয়ও যে অনেক পাইতেছি।

অজপা সাধন ও পাঠের বিধি

কুশল প্রশ্ন ও সাময়িক কথাবার্ত্তার পর বলিলাম, "আমাদের যে সাধন দিয়াছেন, ইহাতে ত দেখিতেছি, মানস জপই সব।

ঠাকুর বলিলেন, "হ্যাঁ, ইহাতে নামই সব! শ্বাসে প্রশ্বাসের দিকে লক্ষ্য রাখার চেষ্টা করে নাম করে যাও, তাতেই সব হবে।"

আমি। কুলগুরুর প্রদত্ত সাধনে ফুল বেলপাতার আয়োজন, আরও কত কি লাগে, আর আমাদের যখন তখন সকল কাজের ভিতরেও সাধন চলিতেছে। একবার সূর্য্য অর্ঘ্য, একবার গণেশপূজা, কিছুই প্রয়োজন হয় না।

ঠাকুর। দেখ, আমরা সেই ব্রাহ্ম সমাজের ছেলে কি না, প্রথমতঃ কিছুই মান্‌তাম না। পূজা সন্ধ্যা ও জানতাম না। আর এখন গোঁসাইএর কৃপায় কোথায় এসে পড়েছি দেখ। আমি বা আমার গুরু ভাইরা দীক্ষার কিছু পর থেকেই গোঁসাইকেই একমাত্র ঠাকুর বলে জানি! অর্থাৎ জল বলিলে যেমন সেই জল বোঝে, ভগবান বলতেও তাঁকেই জানি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি তেত্রিশ কোটী দেবতা আছেন, তাঁদের কেউ ত কম নন্। কিন্তু আমরা ঠাকুরকে সর্ব্বোপরি স্থান দেই, আমার ঠাকুরের পূজা এখন তো ঘরে ঘরেই হচ্ছে। মনে কর টবে গাছ লাগাইলা, আমরা যদি ডাল পাতায় শাখা প্রশাখায় স্বতন্ত্র ভাবে জল দিতে যাই তবে হয়ত কোন

জায়গায় অতি জলে পচে যাবে, কোথাও বা জল মোটে পাবে না। তা' না করে' যদি সোজাসুজি গোড়ায় জল ঢালি, তবে সব জায়গায়ই আপনা হ'তে যতটা জল যেখানে দরকার, তাই যা'বে। তেমনি এক গুরুকে পূজা করলেই সব হয় জানি। স্বতন্ত্র কারুকে জেনে দরকার কি। এক নামে লক্ষ্য রেখে চলে' যাও, সেই যেমন 'আলাদিনের' আশ্চর্য্য প্রদীপ, সেটি পেলেই সব পেলে। যেমন রূপ কথার সোণার কাঠি, না পাওয়া পর্য্যন্ত কোন দিকেই চাহিতে নাই, কিছুতেই প্রয়োজন নাই! এ পাশে ও পাশে কত কি দেখতে পাবে, কোন দিকে তাকাবার আবশ্যকও নাই, চাইলেই ঠকে যবে। তাঁকে পেলেই সব করায়ত্ব হ'ল জান্‌বে! বেশ করে সাধন করে যাও। কখন ওঠ? ভোরে উঠে লেপ মুরি দিয়ে নাম প্রাণায়াম ১ ঘণ্টা করে উঠে এ'লে। হাত মুখ ধোয়া কাপড় কাচা হ'লে আধ ঘণ্টা আসনে বসে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পড়্‌বে। ১ অধ্যায় পড়া নিয়ম, না পার আধ অধ্যায়; তাও যদি না পার ৫টী লাইন পড়ে' গ্রন্থ নমস্কার করে উঠে পড়ো। দুপুরে সময় পাও তো? ১ ঘণ্টা ঐ আসনে বসে কালী সিংহের মহাভারত পড়্‌বে। ১ খানা চৈতন্য ভাগবত, চরিতামৃত মহাভারত, বাল্মিকীর রামায়ণ গদ্য অনুবাদ, না থাক্‌লে কিনে নিয়ো। ১ খানা চৌকিতে কি কেরোসিনের বাক্সের উপর ঐ সব গ্রন্থ রেখে দিও। প্রথম মহাভারত ও চরিতামৃত, শেষে তা শেষ হ'লে, রামায়ণ ও চৈতন্য ভাগবত পড়ো, আবার তার শেষে মহাভারত ও চরিতামৃত পড়ো।

আমি। চরিতামৃত সংস্কৃত বই বল্লেই হয়। অনেক স্থান বোঝা কঠিন। আমি শুধু পাঠ ক'রে যাব, বোঝা যাক্ বা না যাক্।

ঠাকুর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই করো, কঠিন বই কি, তবে পড়্তে পড়্তে গ্রন্থ দয়া করেন, তখন দেখো বেশ বুঝবেও আর কত মধুর বলে' মনে হ'বে। শেষে ঠাকুরের "উপদেশ সংগ্রহ" পড়্তে হ'বে। টবে একটী তুলসী গাছ লাগিয়ে নিয়ো। তা'তে প্রাতে জল দিয়ো, ধূপ ধুনা জ্বালায়ে বসে আগে প্রাণায়াম করো, শেষে যতক্ষণ পার নাম করো। রবিবার এসো, একবার।

ঠাকুর যে আমাকে নিজ হইতে এসব আবশ্যকীয় কথা বলিলেন, তাহাতে আমি বাঁচিয়া গেলাম। কেননা, সাধন নিয়াছি সত্য, কিন্তু সাধন-সাথী কেহ নাই। ভাসুর মহাশয় ও দিদি দূরদেশে থাকেন, আমি বিধি-নিষেধগুলি ভিন্ন আর কিছুই জানিতাম না। আনন্দে তাঁকে প্রণাম করিয়া বাড়ী আসিলাম।

আন্তরিক আকাঙ্ক্ষায় ঠাকুরের দর্শন

তার পরের রবিবারের কথা লিখিতেছি। ভবানীপুরে চলিয়া আসিয়াছি। পৌষ মাস, সকাল হইতেই টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে, তাহাতে শীতও বাড়িয়া গিয়াছে। সকাল হইতে মনে হইতে লাগিল, আজ ঠাকুর যাইতে বলিয়া দিয়াছেন, অথচ কি রকম দুর্য্যোগ আরম্ভ হইল। হয় ত উনি আজ আর বাহির হইতে চাহিবেন না। ঠাকুরপোর পরীক্ষা আসিয়া পড়িয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে উহাঁকে বলিলাম, "দেখ, তুমি ত সেদিন ঠাকুর দর্শন করিয়া আসিয়াছ, আমি আজ একবার দর্শনে যাইব।"

উনি। আজ বড় বিশ্রী দিন, আজ আর নাই বা গেলে। এই ত কয়দিন আগে গিয়াছিলে; তা ছাড়া আজ আমার হাতে টাকাও নাই।

আমি। একটু দুঃখিত ভাবেই বলিলাম, তোমার কোন ইচ্ছায় তো আমি বাধা দেই না, নিজে যখন ইচ্ছা তখন ঠাকুরের কাছে যাও, কিন্তু আমি যেমন যাইব বলিলাম, অমনি কি তোমার টাকারও অভাব হইল? টাকা ত নাই, কত সময় সংসারের জন্যও ত ধার করিতে হয়; আজ আমার বড় মন টানিতেছে, রোজ ত আর তোমাকে বলি না। আজ ধার করিয়া গেলেও যাইব। কেন না, ঠাকুর আজ যাইতে বলিয়াছিলেন।

উনি একভাবেই হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আজ এ বৃষ্টিতে কোথায় যা'ব টাকা ধার করতে! কাল কাছারীতে টাকা পা'ব কাল সন্ধ্যার পর যেও।"

আমি রাগ করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম, দেখিয়া ব্যাগ খুলিয়া বলিলেন, "এই দেখ, দুটী টাকা আছে ব্যাগে, ১টী থাক্ কাল সকালের

বাজারের জন্যে, আর ১টাতে যদি তোমার সুকিয়া ষ্ট্রীটে যাতায়াত হয় ত তখন আমায় ডেক, কি বল? এখন আমি একটু ঘুমাই।" যে কথা সেই কাজ, তিনি লেপ মুড়ি দিলেন। আমি আর কি করিব! নিরুপায় দেখিয়া ঠাকুর ঘরে গিয়া ঠাকুরকেই ডাকিয়া নিবেদন করিতে লাগিলাম, ঠাকুর, আমার অপরাধ নিয়ো না। তুমি যাইতে বলিয়াছিলে, আমি এমনি অধম, যে আমার শক্তিতে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। আজ তুমি যদি আমার মনের অবস্থা বুঝিয়া টানিয়া নাও, তবেই তোমার দর্শন পাই নতুবা আজ আর হইল না। বলিয়া মহাভারত পাঠ করিতে বসিলাম। ঠিক মনে নাই কতক্ষণ পরে, শুনিতে পাইলাম, নীচে গেটের বাহিরে আমার কানে একটা গাড়ীর আওয়াজ আসিল এবং একটী হিন্দুস্থানী ডাকিতে লাগিল, "মাজী, ভাড়া যাওগে এ বাবু ভাড়া যাওগে!" আমি দু'একবার শুনিয়া প্রথমে নিজের কাণকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। পরে বার বার ডাকডাকিতে বিরক্ত হইয়া দেখি, একখানা ভাড়াটে গাড়ীর গাড়োয়ান এইভাবে ডাকাডাকি করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাড়া যাবে? সুকিয়া ষ্ট্রীট্ যেতে হবে।" গাড়োয়ানটী একবার জিজ্ঞাসা করিল, "ভাড়া কত মিল্‌বে?"

আমি বলিলাম, "একটাকা দেব। যাও ত এখুনি চল।" সে বলিল, "পান্‌সিকা দিও, জল্‌দি এস।" ব্যাপার দেখিয়া আমি নিজেই অবাক। বহুকাল ধরিয়া কলিকাতায় আছি। এরূপ ব্যাপার আমার জীবনে আর কখনই হয় নাই। ইহা ঠাকুরেরই কীর্ত্তি, মনে করিয়া তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়া উহাঁকে ঠেলিয়া উঠাইলাম। উনি কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার?" আমি বলিলাম "ব্যাপার কিছুই নয়। শীঘ্র উঠিয়া জামা কাপড় পরিয়া নাও। সুকিয়া ষ্ট্রীটে যাইতে হইবে। গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে।"

সেই গাড়ীতেই ঠাকুরের কাছে গিয়া ঘণ্টা দুই পরে বাড়ী ফিরিলাম।

এই ঘটনা ঠাকুর ও কয়েকজন গুরুভগ্নীর কাছে বলিয়া খুব আনন্দ উপভোগ করিলাম। ঠাকুরও হাসিয়া বলিলেন **"এমনি করেই ত আস্‌তে হয়।"**

ঠাকুরের সহিত কবিতালোচনা

একদিন ঠাকুর কাহার কাছে শুনিয়াছিলেন, আমি একটু আধটু কবিতা লিখিবার চেষ্টা করি এবং দু'একখানা মাসিক পত্রেও উহা মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়। ঠাকুর বড়দিদির কাছে বলিয়াছিলেন "হ্যাঁরে, প্রফুল্ল নাকি কবিতা লিখ্‌তে পারে। আমি কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তা দেখি নাই।" বড়দিদি আমাকে আমোদ করিয়া তাহা একদিন বলিলেন। আমি শুনিয়া বড় মুস্কিলে পড়িয়া গেলাম। কেননা ঠাকুরের হাতে কবিতা দিব,—তিনি বৃথা কথা বলেন না, বৃথা কথা শোনেন না। প্রকৃতিতে আরোপিত কল্পিত রূপ রসের বর্ণনাই আমাদের অধিকাংশ কবিতার প্রাণ। তাহা তাঁহার হাতেই বা কি করিয়া দিব, আর তিনি পড়িবেনই বা কেন?

মনে মনে অনেক গবেষণার পরে খাতার পাতা উল্‌টাইতেই গোঁসাইজীর "বক্তৃতা ও উপদেশ" হইতে লিখিত একটী উপদেশ কবিতাকারে লিখিয়া ছিলাম, তাহা নজরে পড়িল। তখন সেই কবিতাটী এবং সদ্‌গুরুর প্রতি শীর্ষক একটী কবিতা বাছিয়া টুকিয়া লইয়া গেলাম। ঠাকুর তখন সুকিয়া ষ্ট্রীটে। উপরে যাইতেই বড়দিদিকে সম্মুখে পাইয়া, তাঁহাকে চুপি চুপি কাগজ দুইটী দিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতে তেতালায় চলিয়া গেলাম। প্রণামের পর বসিয়াছি, এমন সময় "ভজন-সাধন কেমন চলিতেছে" ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। তারপর বলিলেন, **"তোমরা তো অনেক বই পড়ে থাক। আমার গুরুভাই কিরণ দরবেশের কবিতা পড়িয়াছ কি?"**

আমি বলিলাম, "হ্যাঁ, আমি 'মন্দির' পড়িয়াছি। বইখানি আমার এত ভাল লাগিয়াছে যে, কয়েকটা কবিতা আমার একবার পড়িয়াই মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। অথচ আমার স্মৃতিশক্তি বড়ই খারাপ।" ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, "ওঃ! "মন্দিরের" কথা বলিতেছ? অমন একখানি বই বাংলা ভাষায় দেখা যায় না। ওখানিকে তোমরা কবিতা পুস্তক ও বলিতে পার, অথবা সাধন পুস্তকও বলিতে পার। গোঁসাই-বর্ণিত সাধনের সপ্ত সোপান উহাতে কি সুন্দর ভাবেই লিখিত হইয়াছে। ওর একটা কবিতাও তোমার মনে আছে?"

আমি বলিলাম "হ্যাঁ, মনে আছে বইকি! এইটা আমার বড় ভাল লাগে।"

দ্বারী গো, নহ তুমি কেবল দুয়ারী!
চলিতে মন্দির পথে,
রহিয়াছ সাথে সাথে,
একি তব বিলাস চাতুরী!
নহ তুমি কেবল দুয়ারী।

যেদিন খুলিয়া দ্বার
দিলে মোরে অধিকার,
প্রবেশিতে মন্দিরের
প্রাঙ্গন-তলায়,

ভেবেছিনু একটানে
ছুটিব মন্দির পানে,
সাগর কল্লোল বথা
নদী নেচে ধায়।

বিশাল প্রাঙ্গণ-পরে
যত যাই, পথ বাড়ে,
ঝঞ্ঝা রূপে প্রভঞ্জন
ছুটে স্বন স্বনে ;

কভু ঘোর ঘন ঘটা
বিকাশে বিজলী-ছটা
প্রাঙ্গনের তরুলতা,
নাচায় সঘনে।

কভু আলো কভু আঁধা
একীগো আঁখির ধাঁধাঁ,
শত দিকে শত বাধা
পথ নাহি পাই ;

হেন বিপদের ক্ষণে,
হাত ধ'রে সযতনে,
কে তুমি কহিছ চুপে
"কোন ভয় নাই !"

"নাই—নাই ভয় নাই,
ওই যে শুনিতে পাই,
পুনঃ কেন ভুলে যাই
চলিতে চলিতে ?

ওগো দ্বারী, ওগো রথী,
ওগো মোর নিত্য-সাথী,
আজি মোরে রক্ষা কর,
আঁধারের পথে।

ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, "চমৎকার! নাম জপ সম্বন্ধে কি সুন্দর লিখিয়াছে মনে আছে তোমার?" আমি বলিলাম "না সবটা মনে নাই। প্রকৃতই সে কবিতাটা যেন হীরার টুকরা।

ঠাকুর বলিলেন, "কি চমৎকার ভাবে গোঁসাইএর রূপ বর্ণনা আছে। আমার মনে হয়, ও বইখানা গৃহ পঞ্জিকার মত তোমাদের প্রত্যেকের ঘরে এক একখানা থাকা উচিত। শুধু সাধন পন্থী বলিয়া নয়। রসগ্রাহী ব্যক্তি মাত্রেই এটী পড়লে রস পাবেন, সাধক ব্যক্তি ও সাধন ভজনের কথা কেমন মধুর করে লেখা হইয়াছে দেখিতে পাইবেন।

আমি। আজকালকার কবিতার ধরণই এই হইয়াছে, ভাষা নাকি যত ধোঁয়াটে আর দুর্ব্বোধ্য হইবে, ততই ভাল লেখা বলিতে হইবে।

ঠাকুর। আজ কালকার কথা আর বলো না। ফুল, লতা, পাতা চাঁদ নিয়ে আর কতগুলা ভাল কবিতা লেখা হইতে পারে, সকলেই ত আর রবীঠাকুর হইতে পারে না। একটা পৌরাণিক আদর্শ নিয়ে লিখ্‌লে, কথাটাও বুঝ্‌তে পারা যায় লেখাও হয় ত কষ্ট কল্পিত হয় না। "রাম রসায়ন" বলে একখানা রঘুনন্দন গোস্বামীর প্রণীত বই আছে, দেখেছ?

আমি। "রাম রসায়ন" বই দেখা কেন, নামও ত শুনিনি। তা'তে কি রামায়ণের কথা আছে?

ঠাকুর। হ্যাঁ, বইখানাতে রামায়ণের কথাই আলাদা রকমের অতি মধুর ছন্দে লেখা হ'য়েছে। সময় মত বইটী কিনে নিয়ে ভাল ক'রে পাঠ কোরো। আমি ত রামায়ণ মহাভারত ভিন্ন কোন কবিতার বই বড় একটা দেখি না, কিন্তু "মন্দির"

আমারও অত্যন্ত ভাল লাগে। ওসবভাবে লেখাও একটা সাধনের অবস্থা। গুরু কৃপা ভিন্ন কি আর অমন লেখা হয়? তবু এই ধর, বক্তৃতা ও উপদেশ হ'তে ভাব নিয়ে একটা লিখ্‌লে, কি সদগুরু সঙ্গে কত ঘটনা আছে। তার একটা ধরে কিছু রচনা করলে এই রকম করলে, খুব ভাল। আমার সময়ে সময়ে ইচ্ছা হয় যে, সদগুরুসঙ্গ বইটী গোড়া থেকে ধরে, রামায়ণের, মহাভারতের মত সহজ সরল পদ্যে যদি কেউ অনুবাদ কর্‌তে পার্‌তো! অনেকেই ত উহা নিত্য পাঠ্য করেন কিনা! অবশ্য খুব সময় সাপেক্ষ এবং ভাবের অনুগামী হ'য়ে যতটা সম্ভব, কথা-গুলি বজায় রেখে কবিতা করা বড় সহজ কথা নয়। তবে যদি কেহ কোনদিন ওভাবে কর্‌তে পার, তা হ'লে ছাপ্‌বার জন্য ভাবনা হ'বে না। ওসব গ্রন্থের খুব আদর হবে।"

জীবনে এই প্রথম ঠাকুরের সহিত সাধারণ ভাবে কবিতার সমালোচনা করিলাম। তাহাতে আমি যে "উপদেশ সংগ্রহ" হইতে ভাব লইয়া কবিতা লিখিয়া আনিয়াছি, এ কথা কিছুই বলি নাই। ঠাকুর যেন তাহা দিব্যচক্ষে দেখিয়াই আমাকে উৎসাহ দিবার জন্য ওই কথাগুলি বলিলেন। নানা সময়ে দেখিয়াছি, যখনই কোন প্রশ্ন করিব ইচ্ছা করিয়া ঠাকুরের কাছে গিয়া বসিয়াছি, অথচ জিজ্ঞাসা করি নাই, তখনই ঠাকুর সেটী নিজ হইতেই বুঝিয়া উত্তরটী দিয়া দিয়াছেন। তাঁহার পক্ষে ইহাতে অলৌকিকত্ব কিছুই নাই সত্য, কিন্তু আমরা এখনও সেই কথাগুলি মনে করিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছি যে, আমাদের মত তৃণাদপি তুচ্ছের মনের খবরও তিনি সর্ব্বদাই লইতেন।

"সৎগুরু সঙ্গে" ইষ্ট স্মৃতি

মহাভারত বা রামায়ণ পাঠের পর গিয়া সেই সমস্ত কথা লইয়া ঠাকুরকে প্রশ্ন করিলে যে কি আনন্দই করিতেন, তাহা বলিবার নয়। "মহাভারত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে হয়" বলিতেন। তদ্ভিন্ন "শ্রীশ্রী সৎগুরু সঙ্গের" কথা উঠিলে, ঠাকুরের যেন আনন্দে বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। একবারের কথা এখনও মনে আছে, ঠাকুর অসুস্থ দেহে শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন দাদার বাড়ীতে আসিয়াছেন। সকালে ঠাকুর দর্শন করিতে গিয়াছি, মনে মনে ইচ্ছা, দিনমান থাকিয়া বিকালে ফিরিব। ঠাকুর আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "কখন এ'লে? ভাল আছ ত"। আমি বলিলাম, "এই আসিলাম, ভালই আছি"। "এখনই যাইবে কি?" আমি বলিলাম, "আজ সারাদিন থাকিব বলিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি।"

ঠাকুর খুব আনন্দ করিয়া বলিলেন, "এই রকম করিয়াই ত আসিতে হয়। দেখ, সংসারের ঘানিতে তো নিত্যই ঘুরিতেছ! মাঝে মাঝে একটু এখানে এলে, প্রসাদ পাইয়া গেলে খুব ভাল হয়। এখন এখানে বসিয়া 'সদ্‌গুরুসঙ্গ" একটু পড়িয়া আমাকে শুনাইবে?"

আমি সানন্দে পড়িতে আরম্ভ করিলাম, ঠাকুর নিবিষ্টভাবে শুনিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে সেই সময়ের ঘটনা আরও দু'একটী বলিয়া পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। দুপুরে একবার উঠিয়া গিয়া প্রসাদ পাইয়া আসিলাম। আবার আসিয়া বসিতেই বলিলেন, "আর একটু পড়িবে? এখনই ত যা'বে না।"

আমি আবার পড়িতে আরম্ভ করিলাম ; কিরণদিদি ও সুশীলাদিদি মধ্যাহ্ন হোমের আয়োজন লইয়া থাকিলেন। ঠাকুর হোমান্তে একটু জল-যোগ করিয়া আবার শুইয়া পড়িয়া, পাঠ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। সম্ভবতঃ সুশীলাদিদিই বলিলেন, এখন একটুখানি বিশ্রাম করুন্ না, আবার বিকালে পড়িবে। শরীর ত আপনার বড় কাতর"—

ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "না, না, আমি বেশ বিশ্রাম করিতেছি তোমার যদি কষ্ট হয় ত প্রফুল্ল, এখন না পড়িলে। কিন্তু ঠাকুরের এই সমস্ত কথা আলোচনা করিতে আমি কখনই ক্লান্ত হই না। একটা দিন কি, আমার নিত্যও ইহাতে কষ্ট নাই।" আমি আবার পড়িতে লাগিলাম, ঠাকুর ধ্যানমগ্নের মত স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

কি কথা প্রসঙ্গে ঠিক মনে নাই, ঠাকুর বলিলেন, "গোঁসাই শেষের দিকে সর্ব্বদাই সমাধিতে থাকিতেন, শরীর ও বিষ প্রদানের ফলে অত্যন্ত কাতর হইয়া আসিতেছিল। একদিন আমাদের দুই একটী গুরুভাই ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আজ-কাল এত দীর্ঘ সময় সমাধিস্থ থাকেন, যে আমাদের ভয় হয়, হয় ত আপনি দেহে নাই।" গোঁসাই একটু হাসিয়া বলি-লেন, "আমার শরীরের এমন অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে পরম হংসজী ত যখন তখনই এ দেহ ছাড়াইয়া লইয়া যাইতে পারেন। তবে আমি যখন দেহ ছাড়িব, তখন দুই একটী লক্ষণেই তাহা বুঝিবে। সে লক্ষণ এই, আমি দেহে না থাকিলে সে বিষয়ে তোমাদের কাহারও সন্দেহ উপস্থিত হইবে না। সকলেই এক মনে এক সময়েই বিশ্বাস করিবে যে, আমি দেহে নাই। আর

এখন যেমন ভাবিতেছ, আমার দেহ ত্যাগের পর তোমাদের ভিতরে তেমন একটা শোকের কাতর মলিন ভাব হইবে না।"* আমারা গোঁসাইএর মুখে পূর্ব্বেও শুনিয়াছিলাম বটে যে, মুক্ত পুরুষের দেহত্যাগে কাহারও মনে শোকের কাতরতা আসেনা; কিন্তু তখন ও কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিলাম, ঠাকুর একি বলিলেন? আমাদিগকে কি তিনি এমনি অসার মনে করিতেছেন যে, গোঁসাই দেহ ছাড়িবেন, আর তাঁহার বিরহে আমরা প্রাণে বাঁচিয়া থাকিব? আমার কাছে তখন ঠাকুরের ঔষধ 'মরফিয়া' থাকিত। মনে একবার এ কল্পনাও আসিল, আমার আর চিন্তা কি? সত্যই যদি ঠাকুর আমাদের ফাঁকি দিয়া চলিয়া যান্, তবে ঐ বিষ খাইয়াই আমিও ঠাকুরের অনুগমন করিব। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! মাসখানেক পরে সত্য সত্যই ঠাকুর যখন দেহ রাখিলেন, তখন প্রকৃতই সকলের মনে হইল যে, হয় ত বা ঠাকুর সমাধিতেই আছেন, আবার সমাধি ভঙ্গে উঠিবেন! বরং গুরুভগ্নীদের উন্মাদবৎ অবস্থা দর্শন করিয়া আমি তাড়াতাড়ি আসনের কাছে ঠাকুরের যে মরফিয়ার কৌটা ছিল, তাহা লইয়া অন্ধকার রাত্রে ছুটিয়া গিয়া নিকটবর্ত্তী একটা পুকুরের জলে ফেলিয়া আসিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। ঠাকুরের এমনি খেলা যে, নিজের বিষ খাইবার কথা তখন একবারও মনে হইল না। বরং ঠাকুরের দেহ সমাধিস্থ করিবার আয়োজনেই ব্যস্ত হইলাম।

সেই দিনের স্মৃতিতে ঠাকুর উত্তেজনায় উঠিয়া বসিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে নিমীলিত নয়নে আসনে বসিয়া, আবার বিছানায় শুইয়া

পড়িলেন। শেষে বলিলেন, "সৎগুরু সঙ্গ" পড়িলে খুব ইষ্ট স্মৃতি হয়, ওতেই ত জীবনের পরম কল্যাণ আর কি! নাম ধরিয়া পড়িয়া থাক, ও বইখানি যে কি তাহা পরে বুঝিবে।"

আমি বিকালে ঠাকুরের ওখানে বহু গুরুভাইএর সমাগম হইয়াছে, দেখিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া ভবানীপুরে চলিয়া আসিলাম।

"নাম সব সময়েই করা যায়"

কিছুদিন ধরিয়া প্রতিবেশীরা আমার বাড়ীতে সেলাইএর কল আছে বলিয়া, আমাকে অনেকগুলি জামা সেলাই করিতে দিয়াছেন। ২।১ দিন ছাড়া প্রত্যেকেই তাড়া দিতেছেন; এক একজনকে এক একটী দিয়া, তুষ্ট করিতে না পারায় মনে একটা বিরক্তি আসিল। আমি সারা দুপুরের মেহনতে ২।৩টী জামা সেলাই করিয়া দিই, তাহাতে খুসী হওয়া দূরে থাক্, আরো এত দেরী হইতেছে কেন বলেন। ঠাকুর কলিকাতায় আসিয়াছেন জানিয়া দেখা করিতে গিয়াছি। একথা সেকথার পর ঠাকুর বলিলেন, "তোমার বোধ হয় দুপুরে বেশ অবসর আছে। দুপুরে কি কর?"

আমি বলিলাম, "আগে ত সারা দুপুরই অবসর থাকিত, কখনও বিশ্রাম, কখনও সেলাই, কখনও পাঠ করিতাম। এখন ২।৩টী বাড়ী হইতে জামা সেলাই করিতে দিয়াছে। অনেকগুলি জামা, রোজ খাটিয়াও শেষ করিতে পারিতেছি না। তবে মনে হয় যে, আমি গরীব মানুষ, টাকা পয়সা দিয়াতো কোনকালে কাহারও কোন উপকার করিতে পারিব না, সামান্য গতরে খাটিয়া যদি মানুষের এতটুকু উপকার হয় ত, মন্দ কি। কিন্তু পাঠ করিবার সময় কম হয়, এতেই একটু কষ্ট বোধ হয়।

ঠাকুর বলিলেন, "দেখ, তোমার ভাগ্য ভাল, তাই অন্যের জন্য খাটিবারও অবসর পাও। একটা কথা, এই যে পরের কাজ করিয়া দাও, সর্ব্বদাই মনে রাখিও—ইহাতে তাহাদের উপকার অপেক্ষা তোমার নিজেরই খুব বেশী উপকার হইতেছে। তাহারা এ কাজ অন্যকে দিয়াও করাইতে পারিত, তোমার সৌভাগ্য বশতঃই তুমি তাহাদের এতটুকু সেবা করার অবসর পাইয়াছ, ইহাতে তাহাদের কাছে তুমি কৃতজ্ঞ থাকিতে চেষ্টা করিও। কথাটা বেশ বুঝিলে ত ?

আমি স্তম্ভিত হইলাম। ঠাকুর আমার বিরক্তিটুকু লক্ষ্য করিয়াই এমন অমূল্য উপদেশ দিলেন। একটু থামিয়া আবার বলিলেন,

"নিয়ম মত পাঠও কিছুক্ষণ করিও। আর একটা কম্বল নিয়া বসিয়া সেলাই করিও। একটা সেলাইতে নামের কতটুকু স্মরণ হইল, খেয়াল রাখিও; তোমাদের উদ্দেশ্য নাম করা, সেটী যেভাবে হউক, হইলেই কাজ হইল। নামটাতো সব সময়েই করা যায়। তবে অন্যের কাজ করিয়া দিতেছি, মনে না ভাবিয়া আমি তাহার সেবা করিতে পারিতেছি, আমাকে সেলাই দিয়া আমারই উপকার করিয়াছে, এ ভাবটী মনে আসিলেই কল্যাণ হয়! নামটী অভ্যস্ত হইলে সেলাই করিতে করিতেও বেশ নাম চলিবে, লক্ষ্য করিও"

আমি ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, "আমি ত নাম মোটেই করিতে পারি না। আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন ?"

ঠাকুর অতি কোমল স্বরে বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ সর্ব্বদাই করিতেছি। আমি তোমাদের হইয়া নাম করিতেছি, চেষ্টা করিয়া যাও, সময়ে সবই ঠাকুর ঠিক করিয়া দিবেন।"

স্বপ্ন সকল সময়ে অলীক নহে

তারপর আমার জীবনের আর এক অধ্যায় আরম্ভ হইল। পুত্র বিয়োগের পর ঠাকুরের অনন্য সাধারণ সহানুভূতি পূর্ণ পত্রখানি পাইয়া কিভাবে যে অতি অল্প কালের মধ্যেই সাম্‌লাইয়া উঠিলাম, তাহা একমাত্র ঠাকুরই জানেন। সামান্য কয়েকটী কথার মধ্যে, কি দেব-দুর্ল্লভ সান্ত্বনা ছিল, কি অদ্ভুত শক্তি ছিল, বলিতে পারি না। অত জ্বালা যে কি করিয়া আশ্চর্য্য ভাবে তিনি কমাইয়া দিলেন, ভাবিয়া পাই না।

ছেলেটী মারা যাইবার পূর্ব্বে কয়েটী অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম; তাহার কিছু ঠাকুরকে লিখিয়া জানাইয়াছিলাম। কিছু পরে মুখে বলিলাম, এসব স্বপ্ন কেন দেখিলাম?" ঠাকুর বলিলেন, "তুমি ত বেশ সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখ, ভাল স্বপ্ন দেখা খুব ভাগ্যের কথা। গোঁসাই বলিতেন, এক একজনের স্বপ্নেতে করে' এক একটা দিক পরিষ্কার হ'য়ে যায়। কারো বা স্বপ্নে এমন দুর্ল্লভ অবস্থা লাভ হয়, যা হাজার সাধন ভজনেও লাভ করা কঠিন হয়। ঠাকুরের কৃপাতে যা দেখ্‌ছ, দেখে যাও। কেন দেখেছ বলা যায় না, বলা ঠিকও নয়। কেবল নামটী করিয়া যাও, ঐ পথে কত কি দেখিবার আছে, ঠাকুরের দয়া হ'লে সে সকল দেখ্‌তেই পাবে।

আমি হাসিতে হাসিতে কহিলাম, "সেদিন স্বপ্নে দেখিয়াছি—আপনি আমাকে বলিতেছেন—

"দেখ প্রফুল্ল, তোমাকে এই সব স্বপ্নের কথা, দীক্ষার কথা লিখে রাখতে বলেছিলাম, তুমি ত লিখ্‌লে না, দেখ কে লিখ্‌ছে।"

(আমি চাহিয়া দেখি, আমার স্বামী ফাউণ্টেন কলম হাতে লইয়া দ্রুতভাবে কি যেন লিখিতেছেন, আপনি আমাকে তাহাই দেখাইতেছেন)।"

ঠাকুরও একটু হাসিয়া বলিলেন, "এখনও তো জিতেন কিছু লেখে নাই, তবে ঠাকুর লেখাইলে পরে কি হয় দেখ।"

ও বিষয়ে ঠাকুর আর বিশেষ কিছু বলিলেন না। আজ আমার সেই স্বপ্ন সত্য হইতে বসিয়াছে। জয় দয়াল! ধন্য দয়াল!! তুমি যাহাকে যাহা করাও, সেই তাহা করিতেছে।" "কাষ্ঠের পুতলি যেন কুহকে নাচায়!" সেই কথাটা দয়া করিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝাইয়া দাও যে, তোমার কৃপা ভিন্ন—

"কলৌ নাস্তেব নাস্তেব নাস্তেব গতিরন্যথা।"

শেষ নিবেদন

তপনের মত, হে তাপস ! যবে
প্রথম ধরায় এ'লে,
দেখিনি-ধরণী কেমনে চাহিল
মুগ্ধ নয়ন মেলে' ।
মানুষের বেশে এ'লে মর দেশে
মানুষের ক্লেশে গলি',
অপূর্ব্ব রূপ ধরিলে অরূপ !
তা'দের গলা'বে বলি' !
জন্মে তোমার ধন্যা ধরণী,
কুল পবিত্রব্রত,
মাতা কৃতার্থা, পিতৃলোকেরা
স্বর্গে নৃত্য রত !
সভা মানবের সহজ সরল,
মহান্ অভ্যুদয়,
করিল কেমন অভিনন্দন
বন্দন প্রেমময়,
দেখিনি তা মোরা ; দেখিলাম শেষে-
বজ্র বহিয়া আসে
আষাঢ়ের মেঘে, দেব দুন্দুভি
বাজে বুঝি তারি পাশে ।
সিদ্ধ তাপসে অঙ্কে ধরিয়া
গোলোক আলোকময়,

তারি রেশ বুঝি আকাশের কোলে
বিজলী চমকে রয় !
সপ্তাহ ধরি' কাঁদিল মা ধরা
তোমারে হইয়া হারা,
সেকি অপূর্ব্ব শোকের প্রকাশ !
সে কি অজস্রধারা !
স্তব্ধ নীরব রথ উৎসব,
অশ্রুর বানে ভাসে,
চারু নিকুঞ্জে পাদপ-পুঞ্জে
ঝঞ্ঝা দীর্ঘশ্বাসে !
ভোগ কল্পনা জল্পনা ভরা
সাধের কিশোর বেলা,
নিয়ে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য
খেলিলে যে মহা খেলা।
পুষ্পের মত সুকুমার আর
বজ্র কঠোর হ'য়ে
সত্যযগের মহা আদর্শ
সত্য সাধনা লয়ে !
ও রাঙ্গা চরণে কত পাপী এসে
পেয়েছে অভয় ঠাঁই,
কত তাপী এসে' জুড়াল ত্রিতাপ
সংখ্যা তাহার নাই !
আজ আর তা'রা কেমনে জুড়া'বে
দগ্ধ কাতর প্রাণ ?
মনে পড়ে শুধু হে দরদী, তব

শত দরদের দান !
লুকাইয়া তনু রয়েছ যে আজ
আকাশ বাতাস ভরি'
সকল কর্ম্মে সকল মর্ম্মে,
বুঝাও তা' ভাল করি ;
ত্রিদিব গন্ধ রূপ ও ছন্দ,
ছিল যা তোমারে ঘেরি,
তব পদাঙ্কে আদর্শে তব
আজ যেন তাই হেরি ।
বড় বেদনায় সান্ত্বনা তুমি,
শান্তি নয়ন জলে
তুমি, তুমি সব, হে সর্ব্বময় !
বাঁধি বুক তাই বলে' !

সমাপ্ত ।